১ মে - ১৫ মে ১৯৮৪

কিশোর মন

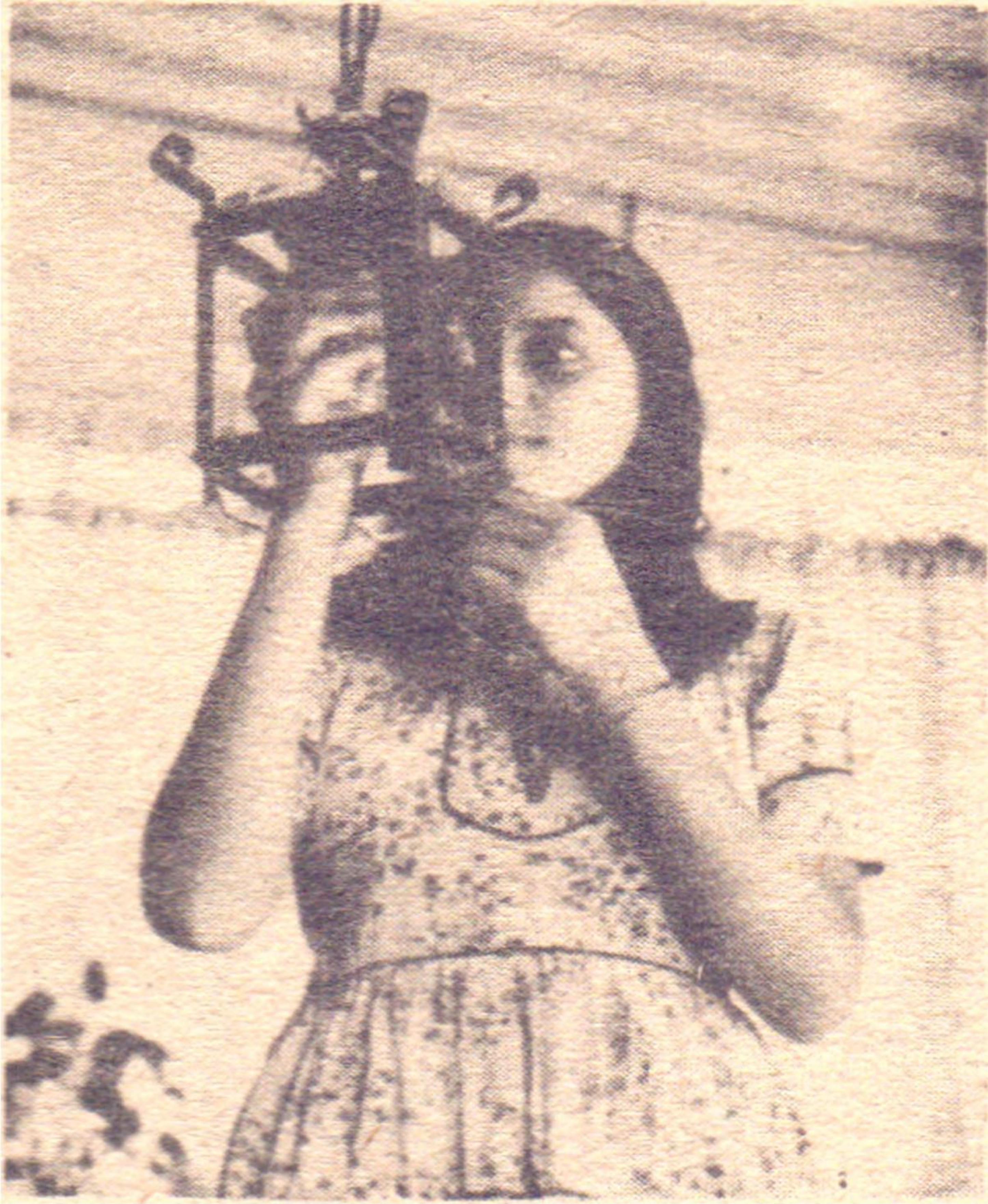

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্টিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

কিশোর মন

সম্পাদকীয়

প্রিয় কিশোর ভাইবোনেরা,

'কিশোর মন' প্রথম সংখ্যাই তোমাদের মন জয় করেছে জেনে কি যে খুশি হলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ঘুপচি রান্নাঘরে গরমে উনুনের সামনে বসে ঘামতে ঘামতে মা যখন রান্না করেন, তখন নিশ্চয় তাঁর কষ্ট হয়, কিন্তু সে কষ্টকে তিনি আদৌ মনে স্থান দেন না, খেতে খেতে তুমি যে খুশিতে উজ্জল হয়ে উঠবে—তারই ছবিটি ভেবে। খাওয়ার সময় তোমার খুশি-উজ্জল পরিতৃপ্ত মুখখানি যদি মায়ের মনে অাঁকা ছবির সঙ্গে মেলে তবে তিনি আবার ওর সহস্রগুণ বেদনার মধ্যেও নামবার প্রেরণা পান। আজ আমরাও তেমনভাবে অনু-প্রাণিত।

এ সংখ্যার কালক্রমে 'রবীন্দ্রজয়ন্তী' সবচেয়ে স্মরণীয় উৎসব। যোগ্য কবি একটা জাতকে সহস্র বৎসর এগিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ এমনই এক কবি। আমাদের সংস্কৃতির এমন কোন প্রান্ত নেই, যা রবীন্দ্রনাথের স্পর্শধন্য নয়। এজনাই আমরা রবীন্দ্র জন্মোৎসবের আয়োজন করে একটা দিন আমাদের কর্মব্যস্ততার ভেতর থেকে ছিনিয়ে এনে রবীন্দ্রচিন্তার মহাসমুদ্রে অবগাহন করে নিই। এ রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ত বটেই, তার থেকেও বেশি আত্ম-উন্নয়ন।

এ উপলক্ষ্যে আমরা বর্তমান সংখ্যায় দুজন অতিথি প্রবন্ধকারের রচনা প্রকাশ করলাম। একজন পদ্মশ্রী অমিতাভ চৌধুরী, অন্যজন অরূপরতন ভট্টাচার্য। এছাড়া একটি কবিতা, লিখেছেন অশোক-কুমার মিত্র। এই সামান্য উপচারেই রবীন্দ্রচর্চা সমাপ্ত করেছি।

এই কালক্রমে আরও একজন মানুষের কথা আসা উচিত ছিল। তাঁর জন্মদিন ১৩ বৈশাখ। এই মানুষটি জন্মেছিলেন কলকাতা থেকে অনেক দূরে, জীবনও কাটিয়েছিলেন সেই গ্রামেই। কিন্তু নিজের শক্তিবলে লাটসাহেব থেকে সাধারণ মানুষ-টির পর্যন্ত সম্মান অর্জন করে গেছিলেন। খালি পা, সাদা ধুতি আর একটি সাদা উড়নি ছিল তাঁর পোশাক। তিনি বলতেন দুই P আমার Prestige and power. সেই দুই P কি কি জান? তিনি বলতেন, I am poor and pure. এই মানুষটি কে জান? ইনি রঘুনাথগঞ্জনিবাসী শরৎপণ্ডিত, দাদাঠাকুর নামে যিনি পরিচিত। দীন জীবন-যাপন অথচ পরিশুদ্ধ মন—এই তো ভারতেরই চিরকালের আদর্শ।

এই দুই পুণ্যাত্মার জন্মদিন স্পর্শ করে যে পক্ষকাল, তা তোমাদের মনকেও পবিত্র করুক, বাইরের সব দীনতার মধ্যেও সমৃদ্ধ করে তুলুক —এই কামনা করি।

প্রথম বর্ষ ● দ্বিতীয় সংখ্যা

১ মে—১৫ মে ১৯৮৪

দাম ৩ টাকা

সম্পাদক

অশোক চৌধুরী

সংযুক্ত সম্পাদক

ডঃ নীরদ হাজরা

শিল্প নির্দেশক

নিতাই ঘোষ

প্রচ্ছদ : নিতাই ঘোষ

সূচীপত্র

দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে এক কিশোরের দুরন্ত সংগ্রামের অশ্রুসিক্ত উপন্যাস

কোটাল / অরুণ আইন / ২০

ঘরে বাইরের দোটানার গল্প

সদানন্দর ঘরে ফেরা / শৈবাল চক্রবর্তী / ৭

মজার ভূতের মজার গল্প

সর্বভূতেষু / সুকুমার ভট্টাচার্য / ১৩

স্বাধীনতার স্বপ্নে রঙিন কাহিনী

শেষ বার্তা / নারায়ণচন্দ্র চন্দ / ৩৯

গ্রাম বাঙলার লোককথা

সোজাপথ বাঁকাপথ / রফিকুল ইসলাম / ৪৮

পোষা জীবের সঙ্গে কিশোরীর ভালোবাসার গল্প

অঞ্জনাদের কালো গাই / অশোককুমার কুণ্ডু / ৫৯

রবিপক্ষের অঞ্জলি

'শিশু' রবীন্দ্রনাথ / অমিতাভ চৌধুরী / ৪

রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান / অরূপরতন ভট্টাচার্য / ১০

সাংবাদিকের বিস্ময়

জন এফ কেনেডি হাই স্কুলে / চিরঞ্জীব / ৬

কৃতী কিশোর

পুরস্কারের চেয়ে ভাইকে বাঁচানোর আনন্দ বেশি / শ্যামলেন্দু চৌধুরী / ৩৭

ফুটবলের বলয় ঘিরে

ফুটবলে দলবদল / হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় / ৫৭

কিশোর মনের প্রাঙ্গণে

বিতর্ক : এ যুগের কিশোররা উচ্ছৃঙ্খল / ৪৪

বিজ্ঞানের খবর / ৫৪

বিজ্ঞানীকে জান

যন্ত্রের জাদুকর নিকোলা টেসলা / বিশ্বজিৎ দাস / ৫৫

বিচিত্র সংবাদ

রাখে হরি মারে কে / বর্ণচোরা রায় / ৪৫

কথা চালার মজার কথা

চিঠি চাপাটি / বিকাশ বসু / ৫১

হাতে কলমে

বায়ুর দিক নির্দেশক / দিলীপকুমার পাঠক / ৫৩

সন্ধানী

শব্দচিন্তা / রুবি ভট্টাচার্য / ৫৬

জানা প্রশ্ন : অজানা উত্তর / চন্দনকুমার নাগ / ৫৬

চোখের ভুল / শংকর মজুমদার / ৫৬

মজার পাতা

কে বেশি বোকা / ধীরেন বিশ্বাস / ৬৪

ছড়া ও কবিতা

রাগের গল্প / বিষ্ণু সামন্ত / ৫ রবীন্দ্রনাথ থেকে / অশোককুমার মিত্র, পাখি / প্রণব মুখোপাধ্যায় / ১৭

রঙের ঘোড়া / রাখাল বিশ্বাস / ৬১

চাইতে জানলে / অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় / ৫২

রঙিন চিত্রকাহিনী

সূর্য-সম্ভব (গায়েব-গ্যায়েবী পর্ব) / ২-৩, ১৮-১৯, ৪৬-৪৭ ও ৬২-৬৩

সম্পাদকীয় দফতর ও কলকাতা অফিস : ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট (পুরাতন প্রিনসেপ স্ট্রিট), কলকাতা ৭০০০৭২

সূর্য-সম্ভব (গায়েব-গায়েবী পর্ব)

চিত্রকাহিনী : তাপস বিশ্বাস
চিত্ররূপ : ধীরেন শাসমল

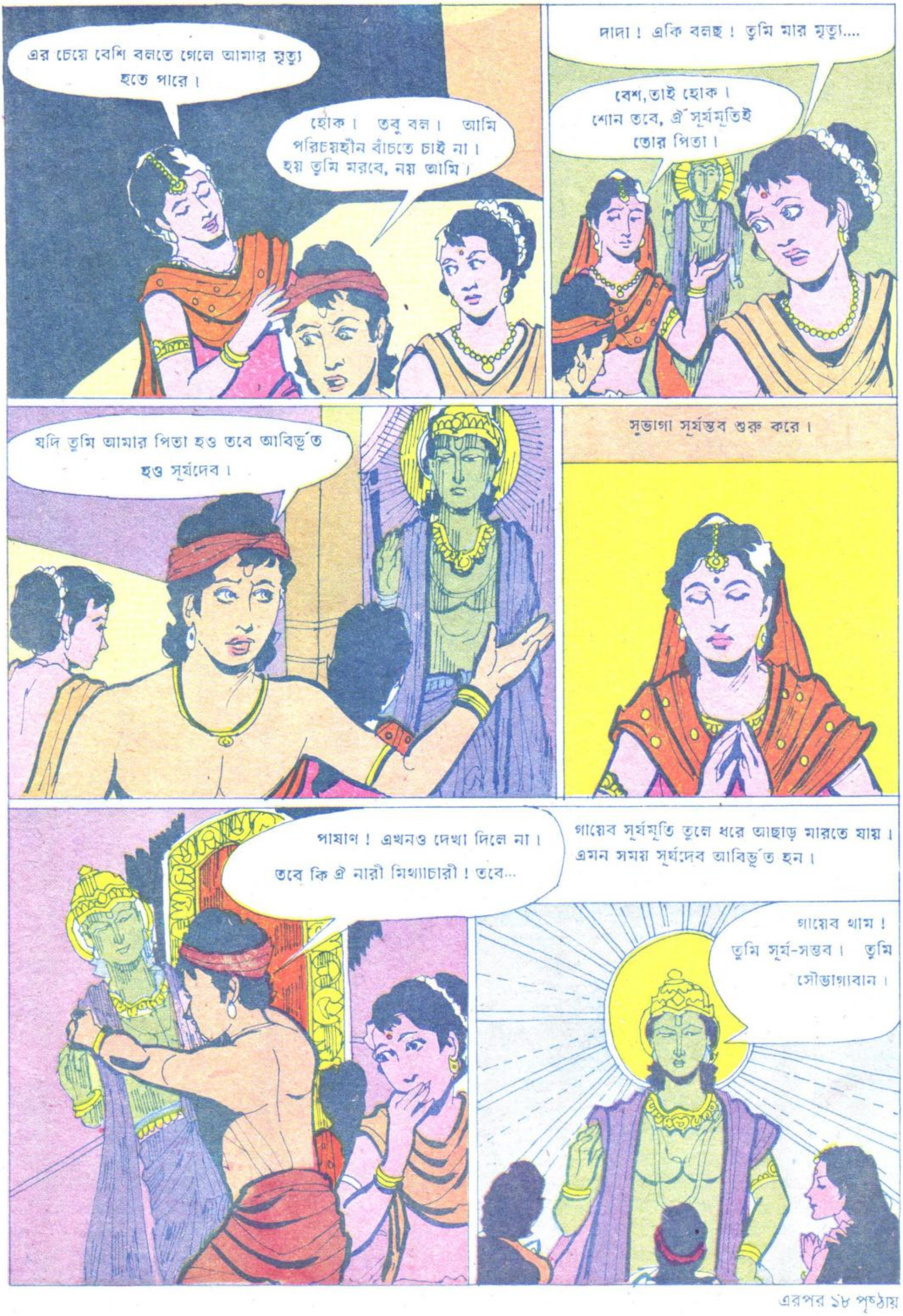
এর চেয়ে বেশি বলতে গেলে আমার মৃত্যু হতে পারে।
হোক। তবু বল। আমি পরিচয়হীন বাঁচতে চাই না। হয় তুমি মরবে, নয় আমি।
দাদা! একি বলছ! তুমি মার মৃত্যু....
বেশ, তাই হোক। শোন তবে, ঐ সূর্যমূর্তিই তোর পিতা।
যদি তুমি আমার পিতা হও তবে আবির্ভূত হও সূর্যদেব।
সুভাগা সূর্যস্তব শুরু করে।
পাষাণ! এখনও দেখা দিলে না। তবে কি ঐ নারী মিথ্যাচারী! তবে...
গায়েব সূর্যমূর্তি তুলে ধরে আছাড় মারতে যায়। এমন সময় সূর্যদেব আবির্ভূত হন।
গায়েব থাম! তুমি সূর্য-সম্ভব। তুমি সৌভাগ্যবান।

এরপর ১৮ পৃষ্ঠায়

'শিশু' রবীন্দ্রনাথ

অমিতাভ চৌধুরী

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বৃহৎ সংসারে শিশু রবীন্দ্রনাথের নিঃসঙ্গতার কথা আমাদের জানা আছে। পরবর্তীকালে তাঁর নানা রচনায়—কবিতায় গল্পে নাটকে—সেই নিঃসঙ্গ শিশু বা বালকের কথা ঘুরে ফিরে এসেছে। ডাকঘর নাটকের অমল চরিত্রেও একই প্রতিচ্ছবি। শৈশবের এই নিঃসঙ্গতা তাঁর জীবনে কোনদিনই কাটেনি। সম্মান আর মানুষের ভিড়েও তিনি ছিলেন একক। ১৯০২ সালে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর এই একাকিত্ব আরও বাড়ে। তবে তারই মাঝে রবীন্দ্রনাথের প্রীতির সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি ছিল শিশুদের সঙ্গে। তাঁর ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা এবং ছোট ছোট ভাইপো-ভাইঝি ভাগনে-ভাগনিরা বরাবরই ছিলেন আদরের ছিলেন সর্বক্ষণের সঙ্গী। বাড়িতে 'ভাই-বোন সমিতি' স্থাপন করে ছোটদের নিয়ে আনন্দোৎসব করতেন। বাড়ির ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যখন 'বালক' পত্রিকা প্রকাশিত হল, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার প্রধান লেখক। শুধু তাই নয় তাঁর কৈশোর ও যৌবনের স্নেহের অনেকখানি ছিল ভাইপো ও ভাইঝি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ইন্দিরা দেবীকে ঘিরে। শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলেও অনেকটা ছিল শিশুপ্রীতি।

স্ত্রী যেবার চলে গেলেন, তখনই এবং তার কিছু পরে রবীন্দ্রনাথ একগুচ্ছ কবিতা লেখেন, যা শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যে নয়, বাংলা সাহিত্যেও বিরল। এই কবিতাগুলোই 'শিশু' নাম দিয়ে ছাপা হয়। শিশুদের জন্যে রূপকথা আছে, ভৌতিক কাহিনী আছে, অ্যাডভেঞ্চার আছে, হাসির গল্প আছে, ছড়া আছে, কিন্তু কথোপকথনের ভঙ্গিতে শিশুদের মনের কথা শিশুদের ভাষায় শিশুদের জন্যে পরিবেশনের এই রীতিটি আজও অনন্য। এই কবিতাগুলির প্রতি রবীন্দ্রনাথের আলাদা দরদ ছিল। তাতে সদ্যোমাতৃহীন শিশুপুত্র শমীন্দ্রনাথের চেহারাটা যেন ঘুরে ফিরে ফুটে উঠেছে। 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের কবিতায় খোকাই নায়ক, খুকির জায়গা নেই। পুত্র শমীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে নিজের শৈশবের মাতৃহীন জীবনের কথাও অনেক কবিতায় ধরা পড়েছে। এই ব্যাপারে তাঁর নিজেরও বক্তব্য আছে। একজন পাঠিকার প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমার এই কবিতাগুলি সবই খোকার নামে। তার একটি প্রধান কারণ এই, যে ব্যক্তি লিখেছে সে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে খোকাই ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে খুকি ছিল না। তার সেই খোকা জন্মের প্রতি প্রাচীন ইতিহাস থেকে যা কিছু উদ্ধার করতে পেরেছে তাই তার লেখনীর সম্বল। খুকির চিত্ত তার কাছে সুস্পষ্ট নয়। তাছাড়া আর একটি কথা আছে। খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ, সেইটে আমার গৃহ-স্মৃতির শেষ মাধুরী। ...মাতৃশয্যার সিংহাসনে খোকাই (শমীন্দ্রনাথ) তখন চক্রবর্তী সম্রাট ছিল। সেইজন্যে অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এইরকম খেলা খেলবে—তাকে নিবারণ করতে পারিনে।'

'শিশু' বইয়ের অনেক কবিতা লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন। স্ত্রী বিয়োগের অশ্রুবাষ্প জমাট বেঁধেছে কবিতার ছত্রে ছত্রে। সেই সঙ্গে মিশেছে মাতৃহারা সন্তানদের প্রতি বাড়তি স্নেহ। তাই বাৎসল্য ও মধুর রস মিশে কবিতাগুলিকে দিয়েছে অসাধারণ মাধুর্য। পিতার দৃষ্টিতে তাই তিনি লিখেছেন 'কেন মধুর' কবিতাটি, বলেছেন 'খোকাকে যখন আমরা সমস্ত রঙিন সুন্দর ও মধুর জিনিস দিয়ে খুশি করি ও খুশি হই তখনই বুঝতে পারি আমাদের জন্য জগতটা কেন এমন রঙিন সুন্দর মধুর হয়েছে। জগতের অস্তিত্বের পক্ষে মাধুর্যটা সম্পূর্ণ অতিরিক্ত। ওর কোন তাৎপর্য পাওয়া যায় না। কিন্তু আমাদের সবরকম ভালবাসার উপলক্ষ্যেই সৌন্দর্যের বিকাশ আমাদের কাছে চরম আবশ্যক হয়ে ওঠে। ভালবাসা না থাকলে সৌন্দর্যের কোন অর্থই হয় না। মধুর হওয়া, মধুর করা প্রেমেরই চেষ্টা, স্নেহেরই আবেগ, ওটা শুধুমাত্র সত্যের প্রয়োজনের বাইরে।'

রবীন্দ্রনাথের তখন অসংখ্য কাজ। কলকাতায় শান্তিনিকেতনে শিলাইদহে। তবু তারই মধ্যে মনকে নিয়ে গেছেন শিশুলোকে। একটি চিঠিতে লিখছেন—'আমি আজকাল শিশুদের মনের ভিতরে বাসা করে আছি। তেতালার ছাদের উপর আমার নিজের শৈশব মনে পড়ছে।' আর একখানা চিঠিতে বলছেন—'যতই লিখছি, নিজের ভিতরে যে বালকাণ্ড আছে তার

সঙ্গে পরিচয় ততই বেড়ে যাচ্ছে।'

খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে
আমি যদি পারি বাসা নিতে
তবে আমি একবার জগতের পানে তার
চেয়ে দেখি বসি সে নিভৃতে।

বাবা ছেলের কথোপকথন বেশি থাকলেও মা এসেছেন ঘুরে ফিরে আড়াল থেকে। কারণ মাকে বাদ দিয়ে শিশুর কাছে কিছু সত্য নয়। মার ব্যথার সে সমব্যথী। বাবার চিঠি না পেলে মায়ের কষ্ট হয় দেখে সে এমন ব্যবস্থা করতে চায় যাতে মা সহজে চিঠি পান। তাই সে নিজে মোটা মোটা অক্ষরে বাবার চিঠি লিখে দেখে এবং তখন---

চিঠি খেলা হলে পরে
বাবার মতো বুদ্ধি করে
ভাবছ দেব ঝুলির মধ্যে ফেলে ?
ককখনো না, আপনি নিয়ে
যাব তোমায় পড়িয়ে দিয়ে
ভালো চিঠি দেয় না ওরা পেলে।

খোকার মনের সকল কল্পনা মাকে নিয়ে। বীরত্বের কল্পনা প্রকাশ পেয়েছে বীরপুরুষ কবিতায়। খোকাই মাকে অভয় দিয়ে বলে, 'আমি আছি ভয় কেন মা করো।' আবার বাবা বিদেশে গিয়ে মাকে কষ্ট দিচ্ছেন টের পেয়ে সে মাকে বলে, বড় হলে সে খেয়াঘাটের মাঝি হবে। তখন সে কী করবে ? তখন—

আবার আমি আসব ফিরে
আঁধার হলে সাঁজে
তোমার ঘরের মাঝে
বাবার মতো যাব না মা,
বিদেশে কোন্ কাজে।

বাবার লেখা সে বোঝে না। সে চায় গল্প, চায় রূপকথা। তার মতে বাবার বই তেমন ভাল নয়। তাই সে মাকে বলে—

বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে
কিছুই বোঝা যায় না লেখেন কী যে।
সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিলেন তোরে,
বুঝেছিলি ?—বল্ মা সত্যি করে।
এমন লেখায় তবে
বল দেখি কী হবে ?

রবীন্দ্রনাথ-মৃণালিনীদেবী—শমীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা কল্পনা নানা ভাবনা এইভাবে শিশুর কবিতায় এসে শুধু ছোটদের নয়, আমাদের সকলকে আনন্দ দিয়ে চলেছে। পত্নী বিয়োগের বিরহ এই বাৎসল্যরসের কবিতাকে মহত্ত্বও দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কবিতাগুলি লেখা শেষ হওয়ার পর নিজেই বলছেন—'এখন আমার শিশুটির কাছ থেকে বিদায়। শিশুকে উপলক্ষ্য করে ছলনাপূর্বক শিশুর মার সঙ্গ পেয়েছিলেম। কিন্তু এমন বরাবর চলে না। পৃথিবীতে আবার আপিস আছে।' □

রাগের গল্প

বিষ্ণু সামন্ত

সোঁদরবনের বাঘের গল্প
সে তো অনেক আগের গল্প
এবার শোনো দারুণ একটা রাগের গল্প।

খিদেয় শেয়াল রাগ করেছে
লেজ বিছিয়ে তাগ করেছে
কাঁকড়ারা তার লেজখানা দুই ভাগ করেছে।

শেয়াল ভায়া কঁকিয়ে কেঁদে
আরো রেগে আ-রো জেদে
ঠিক করেছে ঠকিয়ে দেবে ফন্দি ফেঁদে।

গর্তে দিল মুখ ঢুকিয়ে—
বেরিয়ে এল ধুকপুকিয়ে
তারপরে তো চুন হলো সে মুখ শুকিয়ে।

দু'কানে দুই কাঁকড়া ঝোলে
নেড়ে ঝেড়েও কেউ কি খোলে
দুলিয়ে মাথা শেয়াল শুধু হ্যাঁচ্চো তোলে।

ছবি : সোনালিস

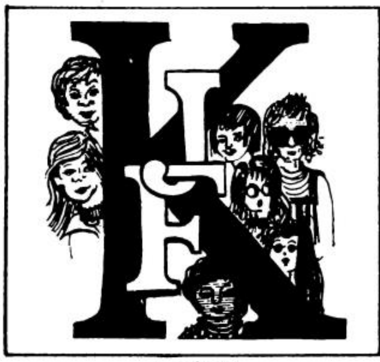

জন এফ কেনেডি হাই স্কুলে

চিরঞ্জীব

(দুই)

অধ্যক্ষের ঘরে জন এফ কেনেডির একাধিক ছবি, ব্রোঞ্জ মূর্তি রয়েছে। রয়েছে তাঁর বলা নানা কথা। তাঁর বিরাট কক্ষে কাঠের দেওয়ালে টাঙানো নানা সার্টিফিকেট ছাত্রছাত্রীদের নানা কাজের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যত রাষ্ট্রীয় পুরস্কার আছে, সবই পেয়েছে এই স্কুলটি। অধ্যক্ষের টেবিলে ছাড়াও চতুর্দিকের স্ট্যাণ্ডে নানা পুরস্কার। কক্ষের এক কোণে দুটি সোফা। বিশিষ্ট কেউ এলে মাস্তুজ্জি তাঁদের সঙ্গে ওখানে বসেই কথা বলেন।

এই যে বিদ্যালয়, তার প্রধানকে দেখলে মনেই হয় না এত বড় দায়িত্ব বা এত সম্মানীয় ব্যক্তি ইনি। শিক্ষক শিক্ষিকারা সরাসরি এসে নানা প্রশ্ন করছেন। সবচেয়ে অবাক হওয়ার—ছাত্রীদের ও ছাত্রদের তাঁর ঘরে অবারিত প্রবেশ। কোন সমস্যা হলে ওরা সরাসরি চলে যায় অধ্যক্ষের কাছে। হঠাৎ কারুর শরীর খারাপ? শরণাপন্ন অধ্যক্ষের। কোন ক্লাসে শিক্ষক বা শিক্ষিকা আসেননি? অধ্যক্ষের কাছে হাজির। আমাদের উপস্থিতিতে ছ'জন ছাত্রী এসে বলল : আমাদের কম্পিউটার ক্লাসে শিক্ষক আসেননি, আজ আপনি যাবেন কি? নিশ্চয়ই—ওঁর উত্তর। তবে পাঁচ মিনিট তোমরা লিডাররা ক্লাস চালাও। আমি বিদেশী এই অতিথিদের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছি।

মাস্তুজ্জি কফি আর কেক খেতে অনুরোধ জানিয়ে কম্পিউটার ক্লাসে চলে গেলেন। পাশের ঘর থেকে ওর সচিব এসে আমাদের নানা প্রশ্নের জবাব দিলেন। দুই সহকারী অধ্যক্ষের অন্যতম লুসিণ্ডা জে হোয়াইট এসে বললেন, অদ্ভুত মানুষ এই মাস্তুজ্জি। কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীকে নামে চেনেন, জানেন কে কোন ক্লাসে পড়ে। অনেক ছাত্রছাত্রী আমাদের কাছে আসতে শঙ্কা বোধ করে, কিন্তু ওঁর কাছে অবাধে পৌঁছে যায়। ছাত্রছাত্রীরা ওঁর প্রাণ। অধ্যক্ষের দেরি দেখে সহ-অধ্যক্ষের সঙ্গে ক্লাস দেখতে গেলাম। করিডরে পেপসি কোলার কিয়স্ক দেখিয়ে বললেন, স্কুলের মধ্যে পেপসি কোলা বিক্রি বে-আইনি। কমার্শিয়াল বা বাণিজ্যিক কিছু করা নিষেধ। অধ্যক্ষমশাই কিন্তু বে-আইনি কাজকে অনুমোদন দিয়েছেন। তবে অন্যভাবে। পিপাসার্ত ছেলেমেয়েরা যাবে কোথায়? উনি বলেছেন, পেপসি বিক্রি হবে। তবে এর লাভটা যাবে ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণ তহবিলে। পেপসি কর্তৃপক্ষ প্রচারের লোভেই ওখানে কাউণ্টার করে দিয়েছেন।

শনি, রবি ছুটি। পাঁচদিনই ক্লাস শুরু হয় সকাল ৯ টায়, শেষ ৩ টা ৩০ মিনিটে। প্রতিদিন ন'টি পিরিয়ড ৪০ মিনিট করে। সব ক্লাসেই ছাত্রছাত্রী ৩৪ জন। গরিব, ধনী সব পরিবারের ছেলেমেয়ে এখানে পড়তে পারে। টেস্টে পাস করলে হল। তবে শতকরা ৩০টি আসন অশ্বেতকায়দের জন্য।

সাদা-কালোয় ভেদ নেই—এ কথার প্রমাণ ক্লাসগুলোয় প্রবেশ করলে তেমন বোঝা যায় না। ক্লাসে তো শিক্ষক বা শিক্ষিকা থাকেন! ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী একত্রে টিফিন করতে পারে এমন দুটি হলে গিয়ে দেখি শ্বেত ও অশ্বেতকায়ে কোন ভেদ নেই। একই টিফিন বাক্স থেকে ওরা ভাগ করে খাচ্ছে। যারা গরিব, তাদের অনেকের হয়তো ভাল টিফিনের সামর্থ্য নেই। ধনী বন্ধুরা ঐ সমস্যার সমাধান করে। প্রয়াত প্রেসিডেণ্ট জন এফ কেনেডি এটাই চেয়েছিলেন। ধনী-গরিবে ফারাক যদি না থাকে, সাদা-কালোয় যদি ভেদ না থাকে, অনেক সমস্যাই তাহলে মিটে যেত।

স্কুল থেকেও দুই ধরনের টিফিন সরবরাহ করা হয় তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পিরিয়ডের পরে। যাদের ফ্রি-পাস থাকে তাদের বিনামূল্যে লাঞ্চ দেওয়া হয়। যাদের রিডিউস্‌ড পাশ থাকে, তাদের প্রতিদিন লাঞ্চের জন্য ২০ সেণ্ট দিতে হয়।

এখানে পড়ান হয় : বিজনেস এডুকেশন, কমিউনিকেশনস, ইংলিশ, ফাইন অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস, ফরেন ল্যাংগুয়েজ, হেলথ কেরিয়ার্স, হেলথ অ্যাণ্ড ফিজিক্যাল এডুকেশন, ম্যাথমেটিক্স, মিউজিক, সায়েন্স, সোস্যাল স্টাডিজ ও স্পেশ্যাল এডুকেশন।

(চলবে)

অধ্যক্ষর ঘরে প্রয়াত প্রেসিডেণ্ট কেনেডির ছবি, মূর্তি ও অন্যান্য পুরস্কার। ছবিঃ চন্দন চ্যাটার্জি

সদানন্দর ঘরে ফেরা

শৈবাল চক্রবর্তী

কু'ড়ের বাদশা যাকে বলে সদানন্দ ছিল ঠিক তাই। কাজকর্মে মন ছিল না তার এতটুকু। দিনরাত শুয়ে বসে থাকতে পারলে ভারি খুশি। অথচ ওর হাতের কাজের খুব নাম ছিল এককালে। ওর তৈরি লক্ষ্মী, গণেশ, চিত্রবিচিত্র করা মাটির সরা ভাল দামে বিকোত গোচারণের হাটে। কিন্তু এমন খেয়ালি লোক যে সারা সপ্তাহ হয়ত কাজেই হাত দিল না। আবার যখন হাঁড়িতে চাল একেবারে তলায় গিয়ে ঠেকেছে তখন গিয়ে বসল মাটির তাল নিয়ে।

একে কু'ড়ে তায় ভবঘুরে। ওই ছেলেটার মায়ায় যা ঘরে পড়ে থাকত দু-চারদিন। একদিন তাকেও ছেড়ে পড়ল বেরিয়ে। ছুটো পাঠশালা থেকে ফেরার পথে কোন পুকুরে যেন পদ্মফুল দেখেছিল। ঘরে এসে বাপকে বলেছিল; আমাকে অমনি একটা ফুল এনে দেবে বাবা?

মা-মরা ছেলেটা কোন জিনিসের জন্যে বায়না করলে সদা না দিয়ে পারে না। অমনি কাঁধে উড়ুনি ফেলে পড়ল বেরিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে গোচারণ ছাড়িয়ে কতদূর যে চলে এল হু'স রইল না তার। আসলে অনেকদিন বাইরে পা দেয়নি, তাই এখন এই খোলা মাঠ, অ'াকাবাঁকা পথ আর একটা পাহাড়ের চূড়ো তাকে মনে করিয়ে দিল যে, এইরকম দৃশ্য তার কত প্রিয়। ব্যস, সদানন্দ ভুলে গেল ছেলের কথা, ভুলে গেল সে কেন বেরিয়েছিল পথে।

সেই যে উধাও হয়ে গেল, ফিরে এল পাঁচ বছর বাদে। তখন বয়স তার পঞ্চাশ পার হয়ে গিয়েছে। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চুলে পাক ধরেছে, গায়ের রং রোদে পোড়া।

সবাই বলল, এক জব্বর জিনিস সঙ্গে নিয়ে এসেছে সদা পাগলা।

জিনিসটা একটা তুচ্ছ খড়ি। কিন্তু তা দিয়ে যা অ'াকা যায় তাই নাকি সত্যি হয়ে ওঠে। শুনে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল সদার ভাঙা কু'ড়ের দোরগোড়ায়।

খড়িটা জব্বর। তরাইয়ের জঙ্গলে এক গুণীন নাকি সদার গান শুনে খুশি হয়ে তাকে এটা দিয়েছে। অনেক জড়ি-বুটি ছিল বুড়ো গুণীনের ঝোলায়। তার ভেতর থেকে এই মেটে রংয়ের খড়িটা বার করে সদানন্দকে দিয়ে বলেছিল, এটা নিয়ে যা তুই।

সদার মাটির ঘরের আধখানা তিনবছর আগেই ভেসে গিয়েছিল বিদ্যাধরীর বানে। তার মন বলে ছুটোও হয়ত ভেসে গিয়ে থাকবে অকূলে। সদা এখন সেই ভাঙা ঘরেই কাঁথা পেতে শোয়, খিদে পেলে চালে ডালে ফুটিয়ে খায়। কিন্তু মানুষজন এলে ওই খড়ির গুণে থালাভর্তি রাজভোগ তুলে দেয় তাদের হাতে।

সদা অ'াকতে ভালবাসে ফুল, লতানে গাছ, রাজহাঁস এইসব। এই গোচারণের ওপারেই চবুতরা শুকনো পাথরের দেশ। সেখানকার লোকদের আবদার মত খড়ির টানে সে সেখানে গাছপালা তৈরি করেছে! আগে যেখানে ছিল বালি আর পাথর এখন সেখানে ফুলফলের বাগান। ছেলেমেয়েদের খুশি করার জন্যে সে সকালবেলা উড়িয়ে দেয় রঙিন পাখির ঝ'াক। রাতে বাড়তি একমুঠো তারা ঝিকিয়ে ওঠে আকাশের মাঝমধ্যিখানে। খোড়ো ঘরের চালে ময়ূর ডেকে ওঠে। পুকুরে ঘাই দিয়ে ওঠে বড় মাছ। যেখান দিয়ে চলে যায় আধপাগলা মানুষটা তার পেছনে পড়ে থাকে কিছু রং আর কিছু খুশি।

সদা ফিরে এসে তার পুরনো বন্ধুদের খোঁজ করেছিল। শুনেছিল তারা অনেকেই গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছে শহরে। যে তিনজনের কোন খবর পায়নি তারা হল রঘু, বিশু আর কালী। এরা গাঁয়ে থেকেও কিন্তু সদার সামনে আসে না। লুকিয়ে দেখে বেড়ায় তার যাদু-খড়ির খেল।

সদা এক একটা ছবি আঁকে আর তা সত্যি হয়ে উঠতে দেখে ওদের চোখ কপালে ওঠে। মানুষের ভীড়ের মধ্যে তিনজন এমন মুখে মাথায় কাপড় জড়িয়ে থাকে যে সদা ওদের চিনতে পারে না। দিনে রাতে যেখানেই যায় সদানন্দ, ওরা পিছু ধাওয়া করে ছায়ার মত।

একদিন বিকেলে এক গেরস্থবাড়ি থেকে চাল ডালের সিধে নিয়ে পথে নেমেছে সদা। অমনি তিনজনে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে তার সামনে। আজ ওদের মুখে ঢাকা নেই। সদা কিছুক্ষণ ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে, রঘু, বিশু, কালী!

তিনজনে হাসতে হাসতে মাথা নাড়ে। ওদের মধ্যে রঘু মিশকালো। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, বিশে রোগা-পটকা আর কালীটার মাথায় টাক, চেহারা ঘাড়ে-গর্দানে।

সদার কাঁধে হাত রেখে রঘু বলে, তুই তো দিব্বি ভেল্কি শিখেছিস এ্যাঁ! তাক লেগে যায় দেখে।

লজ্জা পেয়ে সদা বলে, সব গুণীনের দান ভাই। মানুষটার গুণের অন্ত ছিল না। কদিন একটু সেবা করেছিলুম তাতেই খুশি হয়ে খড়িটা আমায় দিয়ে বলল, 'এটা নে তুই। যেখানে মাটি আছে সেখানে ফুল ফোটাবি, যেখানে দেখবি খরা সেখানে বইয়ে দিবি জলের ধারা।'

ফ্যাঁচ করে হেসে কালী বলে, আমাদের যে একটা জিনিস চাই।

একগাল হেসে সদা বলে, কি নিবি বল। পোশাক-আশাক, মণ্ডা-মিঠাই—যা চাইবি সব হাজির করবে এই খড়ি। আর একেবারে সেরা জিনিস। ভেজাল পাবি না এক ছটাক।

কালী মাথা নেড়ে বলে, আমাদের ওসব কিছু চাই না।

রঘু বলে, আমরা চাই তিনটে ছোরা, তিনটে বন্দুক আর—

চুপ, চুপ—রঘুর কথার মাঝখানেই নিজের দুই কানে দুই হাতচাপা দিয়ে বলে ওঠে সদা, এসব শুনলেও পাপ হয়। গুণীন বলেছেন, 'কারু ক্ষতি কখনও করতে চাইবি না। কেবল আনন্দ বিলিয়ে বেড়াবি। যদি লোভে পড়ে কিছু করতে যাস তবে এ খড়ি খাঁড়া হয়ে কোপ দেবে তোর গলায়। আর কক্ষনও এমন কথা বলবি না আমায়।'

সদার ধমক শুনে থতমত খেয়ে যায় ওরা। একটু পরেই ফিসফিস করে রঘু বলে ওঠে, তাহলে কি তুই তোর ছেলের খবর চাস না?

কে? ছুটো?—অমনি যেন ঘুম ভেঙে যায় সদানন্দর। খপ করে রঘুর হাত চেপে ধরে সে, বল সে কোথায়? বল এখুনি।

রঘু হাসে। তার মিশকালো মুখে শাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করে। যেন একটা জল্লাদ। আস্তে আস্তে বলে, আমি যা চাইছি, তুই আগে দে আমায়।

কি চাইছিস তুই?—সদার গলা এখন অনেক নরম।

তিনটে গাদা বন্দুক।

আমি পারব না—সদা মাথা নাড়ে জোরে জোরে।

বেশ তাহলে জানা গেল ছুটোর খোঁজ চাস না তুই। ছেলেটা তোর জন্যে কত কেঁদেছে তা যদি তুই জানতিস—রঘু আড় চোখে সদানন্দর মুখের ভাব লক্ষ্য করতে করতে বলে, নদী যখন তোর ঘর ভেঙে দিয়ে গেল তখন কত লোকের দোরে দোরে যে ঘুরেছে!

কালী হাসে, আমরা তো রোজ তাকে দেখি। জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে ও দেখে আকাশে পাখি উড়ছে, বাতাসে লাট খাচ্ছে ময়ূরপঙ্খী ঘুড়ি।

সদার মনে পড়ে ছেলেটা ঘুড়ি আর পাখি খুব ভালবাসত। একটা পাখি পুষেছিল। খাঁচায় তাকে নিয়ে ওর কত খেলা! ঘুড়ি কেনার পয়সা জুটত না, তাই অন্য ছেলেদের ওড়ানো ঘুড়ি দেখে দাওয়ায় নাচত হাততালি দিয়ে।

সদা আর দেরি করে না। হাঁটু মুড়ে বসে কোঁচড় থেকে খড়িটা বার করে গুণীনের উদ্দেশে প্রণাম করে মেঝেতে আঁকতে শুরু করে। একটু পরে দেখা যায় রঘু, কালী আর বিশুর হাতে নতুন গাদা বন্দুক একটা করে। ওদের চোখগুলো জ্বলে পোড়া কয়লার মত।

কি রে এবার চল, দেখা আমার ছুটো কোথায়?

তিনজনে চমকে ওঠে। সদানন্দকে যেন নতুন চোখে দেখে ওরা। যে লোকটার এত খানি ক্ষমতা না জানি সে আরও কত অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে।

এখন বিদ্যেধরীর ওপারে সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। হাঁটতে হাঁটতে ওরা গোচারণের একেবারে শেষে সেই গম্বুজওয়ালা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ায়। পশ্চিমের এক ধনী এখানে তিল আর তিসির কারবার ফাঁদবে বলে এ বাড়িটা বানিয়েছিল। তার একটু তফাতে একটা শালগাছের নিচে দাঁড়ায় রঘু আর তার দলবল। দোতলায় একটা খোলা জানলার দিকে আঙুল তুলে রঘু সদাকে বলে, ওই দেখ ওই ঘরে আটক আছে তোর ছুটো।

সদার চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়। খানিক পরে একটা ছেলে এসে দাঁড়ায় সেই জানলায়। সূর্য এখন পাটে বসেছে। তবু চোখের ওপর হাত রেখে সদা যতটা ঠাহর করতে পারে তাতে মনে হয় ও ছুটোই।

এই পশ্চিমাবাবুদের কোন ছেলে নেই, রঘু তার কানে কানে বলে, তাই ওরা ছুটোকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে জায়গা দিয়েছে ঘরে।

সদার ইচ্ছে করে তখুনি ছুটে যেতে ছুটোর কাছে। কিন্তু দেউড়িতে তিন-তিনটে দারোয়ান। ভেতরে ঢুকতে গেলেই দেবে লাঠির বাড়ি।

আমি তোর ছুটোকে ছাড়িয়ে এনে দেব। —রঘু সদার কাঁধে হাত রাখে, আজ রাতে সজাগ থাকিস একটু।

সে রাতে আচমকা ঘুম ভেঙে যায় সদানন্দর। চীৎকার আর দুমদাম শব্দে কাঁপছে যেন চারদিক। সদা ছুটে ঘরের বাইরে আসে। পুবপাড়ার সেই গম্বুজওলা বাড়িটা ঘিরে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। আর শোনা যাচ্ছে বন্দুকের দুমদাম। পড়ি কি মরি করে ছুট দেয় সদা সেদিকে।

সদার সন্দেহ ঠিক। রঘুর দল হানা দিয়েছে পশ্চিমাদের বাড়ি। ধানের মরাইয়ে আগুন জ্বলছে, জ্বলছে বাড়ির জানলা-কপাট। বন্দুক হাতে রঘুকে দেখাচ্ছে যেন ডাকাত সর্দার। বিশু আর কালী সিন্দুকের তালা ভাঙছে। সদার ভীষণ রাগ হয়। এই জন্যে বন্দুক চেয়েছিল। শয়তানের দল! ওদের নজর এড়িয়ে সে উঠে যায় দোতলায়। দরজার পাল্লাটা জ্বলছে দাউ দাউ করে। একটা বাঁশের খোঁচায় সেটা ফেলে দেয় সদা। ভেতরে বিছানার ওপর অঘোরে ঘুমোচ্ছে ছেলেটা। চটপট তাকে চাদর মুড়ি দিয়ে কাঁধে ফেলে সাবধানে নেমে আসে নিচে। খিড়কির কাছে কেউ নেই। ওরা বোধহয় লুঠের মাল ভাগ করতে ব্যস্ত।

বেশ খানিকটা পথ চলে এসেছে সদা। আস্তে আস্তে আঁধার ফিকে হয়। কাঁধের ওপর ঘুমন্ত ছেলেটা উসখুস করে। ছুটোকে এক নজর দেখার জন্যে অধীর হয় সদা। একটা ঢিপির ওপর বসে ঘুমন্ত ছেলের মুখের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়েই চমকে ওঠে সে। এ তো ছুটো নয়। ঠিক তারই বয়সী তবে এ তো অন্য কেউ।

সদার রাগ ধরে। কার না কার ছেলেকে সে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে এল এতদূর! অলক্ষুণে কোথাকার।

এই তুই কে রে?—গর্জে ওঠে সে আচমকা।

বড় বড় ঘুম ভাঙা চোখ মেলে সদানন্দর মুখের পানে তাকিয়ে ছেলেটা জবাব দেয়, আমার নাম মতি।

তুই ও বাড়িতে কি করে এলি ?

সেই যে বছর নদীতে বান এল, মতি শূন্যে আঙুল তুলে যেন গল্প শোনায়, আমাদের দেউলডির ঘর তাতে গিয়েছিল ভেসে। মা-বাবা কোথায় যে হারিয়ে গেল হদিস পাইনি। আমি একটা চৌকির কাঠ ধরে ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকলুম এই বাড়ির ঘাটে। বাবুরা আমায় সেই থেকে থাকতে দিয়েছে ওদের ঘরে।

ঠিক যেন ছুটোর গল্প। ওই বানের জলে ভেসে যাওয়ার। সদানন্দ একমনে কি ভাবে।

হঠাৎ মতি প্রশ্ন করে, তোমার ঘর কোথা গো ?

গোচারণ।—সদা জবাব দেয়।

তবে তো আমাদের পাশের গাঁ,—মতি উৎসাহ ভরে বলে, আমি তোমার সঙ্গে যাব ; ওরা বলছিল আমায় নিয়ে যাবে ওদের দেশে।

সে তো অনেক দূর।

আমি তো আর ফিরব না গাঁয়ে, উদাস গলায় বলে সদা, এই নদীর ওপরে খুঁজব নতুন কোন ঠাঁই। মনে মনে বলে, গোচারণের সব জায়গায় ছুটোর গল্প ছড়ান আছে এখানে টি'কতে পারব না আমি।

আমাকেও নিয়ে চল না তোমার সঙ্গে—মতি বলে মাথা ঝাঁকিয়ে, আমি খুব হাঁটতে পারি দেখবে ?

টুপ করে ঢিপির ওপর থেকে মাটিতে লাফ দিয়ে পড়ে মতি হাঁটতে থাকে লম্বা লম্বা পা ফেলে।

ঠিক ছুটো এমনি করত। সদার মনে পড়ে। পাল্লা দিয়ে হাঁটত তার সঙ্গে। যখন হেঁটে পারত না, লাগাও দৌড়। ছুটতে ছুটতে হাসত আর বলত, এমা হেরে যায়।

এখন সদাকে ছুটে ওর নাগাল পেতে হয়। দুজনে খানিক পথ এসে থামে এক দীঘির সামনে। জল টলটল করছে সে দীঘিতে, আর তার মাঝখানে একটি পদ্মের কুঁড়ি যেন ফুটব ফুটব। সদার মনে পড়ে গাঁ ছাড়ার দিন এমনি একটা পদ্মফুল চেয়েছিল ছুটো তার কাছে। সেই তার শেষ আবদার।

চ, ওই দীঘির জলে হাত মুখ ধুয়ে নিই।

দুজনে পাড়ে গিয়ে বসে। ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা চোখে মুখে দিয়ে আরাম পায় সদানন্দ। হঠাৎ তার মনে হয় ছেলেটার খিদে-টিদে পায়নি তো ?

মতি তখন পাড়ে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা ঢেলা ছুঁড়ছে দীঘির জলে। ঢেলাগুলো ডুবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠে মিলিয়ে যায় পাড় পর্যন্ত। সে খেলা দেখতে দেখতে সদানন্দ জিগ্যেস করে, এই তোর খিদে পায়নি ?

মতি অমনি ঘাড় নেড়ে জবাব দেয়, হ্যাঁ।

কি খাবি ?

ফিক করে হেসে মতি জবাব দেয় মণ্ডা আর জিভেগজা। বাবুদের বাড়ি তাই খেতুম সকাল বিকেল।

অন্যমনস্কের মত সদা বলে, তবে চোখ বোজ।

বাধ্য ছেলের মত দু চোখের ওপর দুটি হাত চাপা দেয় মতি। তারপর চোখ খুলে অবাক হয়ে সদানন্দকে বলে, তুমি যাদু জান ?

তার সামনে তখন একটা ধামাভর্তি মণ্ডা আর একটায় জিভেগজা।

আমি না, এই খড়ি।—সদানন্দ হাতের তালুতে রাখা খড়িটা দেখায়।

দেখি, দেখি—মতি ছোঁ মেরে তুলে নেয় খড়িটা। তারপর পাথরের ওপর তার কাঁচা হাতে পাখি, খরগোস আরও কত কি আঁকে। কিছুই যখন সত্যি হয় না তখন 'দূর ছাই' বলে সেটা ছুঁড়ে দেয় দীঘির জলে।

সদার বুকের ভেতর ধড়াস করে ওঠে। তারপর মনে হয় আপদ গেল। ওই যাদু খড়ি নিয়ে এতদিন কি অশান্তিই গেছে। খড়ির যাদু দেখাতে দেখাতে তার এক এক সময় মনে হত সে সব পারে। কিন্তু এত করেও তো সে ছুটোকে ফিরে পেল না। এ দুঃখ রাখার জায়গা নেই তার।

তার পরই চোখ পড়ে দীঘির মাঝখানে। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কুঁড়িটা তার সবকটা পাপড়ি মেলে এখন হয়ে উঠেছে একটা মস্ত পদ্মফুল।

তখনই আবার মনে পড়ে ছুটো এই ফুল কত ভালবাসত। মনে পড়ে গোচারণে তার ঘরের লাগোয়া জমি চষেছে সে নিজের হাতে। বীজধানটুকু ছড়ানই বাকি এখন।

মতির কাঁধটা ধরে বলে, এই চ। ঘরে যেতে হবে না ?

ঘর ? —মতি অবাক হয়ে তাকায়।

হ্যাঁ রে, নদীর ধারে আমার একটা কুঁড়ে আছে, বলিনি তোকে ? ঘরটা নতুন মেরামত করেছি। জমি চাষ করেছি……তুই পারবি না ক্ষেতে বীজধান ছড়াতে ?

কেন পারব না! আমি তো আমার বাপের সঙ্গে কাজ করতুম ক্ষেতে। —হি হি করে হাসে ছেলেটা।

সদার মনে পড়ে ছুটো ঠিক এমনি করে ঘাড় নাড়ত, হাসত। হঠাৎ তার মনে হয় সকালের এই আলো তার চোখ খুলে দিয়েছে। এই বাতাস তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে তার নিজের কাছে।

একটা ধামা নিজের মাথায় তুলে নেয় সদানন্দ আর একটা তুলে দেয় মতির মাথায় বলে, পা চালিয়ে চললে রোদ ওঠার আগেই পৌঁছে যাব আমরা, বুঝলি ?

মাথায় ধামা নিয়ে আগে আগে চলে সদা পেছনে মতি। মতি বারে বারে পেছিয়ে পড়ে কেন না ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে নিজের মনে কথা বলে, ফুল দেখলে ছুটে যায় তা তুলতে। হঠাৎ ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে দুধের মত সাদা একটা খরগোস। বাসা ছেড়ে আসা পাখিরা তার মাথার ওপর ওড়াওড়ি করে।

একটু তফাতে দাঁড়িয়ে মতির খেলা দেখে সদানন্দর মনে পড়ে যায় এইরকম পাখি আর খরগোসই তো তখন আঁকতে চেয়েছিল ছেলেটা। তখন তারা জীবন্ত হয়নি কিন্তু এই তো এখন সত্যি হয়ে ধরা দিয়েছে তার কাছে।

আর তখনই তার মন ভরে যায়। মনে হয় ছুটো হারিয়ে গেছে এ কথাটা ভুল। ওই পাখি আর খরগোস এই সকালবেলার আলো-বাতাসের মত জলজ্যান্ত সে এখন তার চোখের সামনে।

যে সরু পথটা ধরে অনেক তাড়াতাড়ি গোচারণে ফিরে যাওয়া যায় সেই পথের গাছ-গাছালির ছায়ায় দাঁড়িয়ে খেলায় মত্ত ছেলে-টাকে নরম গলায় ডাক দেয় সদানন্দ, তাড়াতাড়ি আয় বাপ। এখনও অনেকটা পথ বাকি ঘরে যেতে।

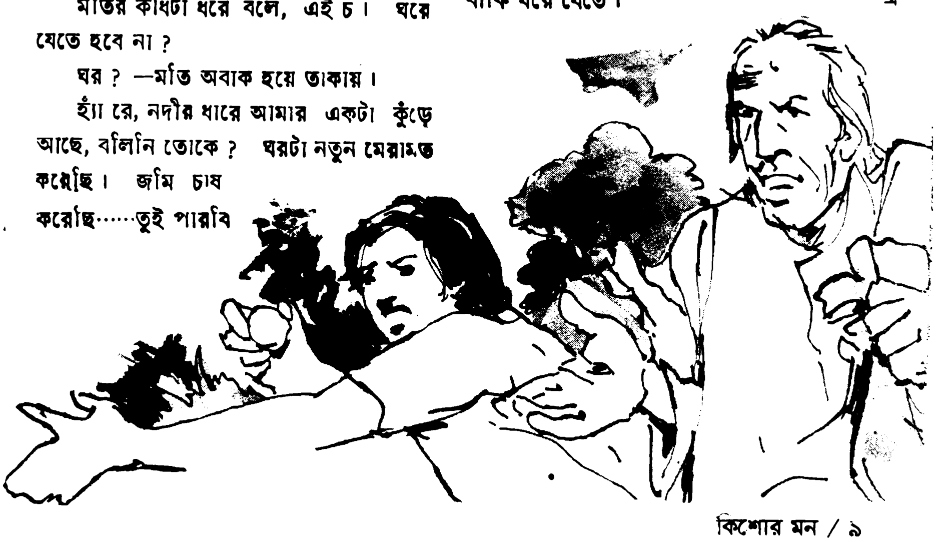

ছবি : দেবাশিস

রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান

অরূপরতন ভট্টাচার্য

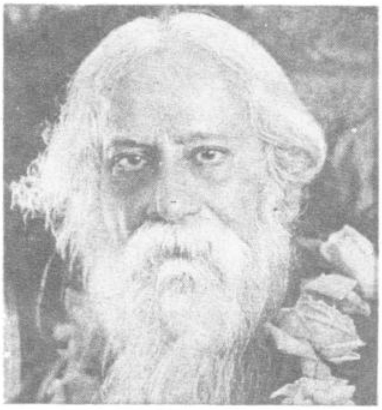

আজকালকার ছেলেমেয়েরা যে পরিবেশে বিদ্যাভ্যাস করে, স্কুলে পাঠ্যক্রমের যে বোঝা তাদের বহন করে চলতে হয়, তা এতই গুরুভার যে, সেখানে মুক্তির অবকাশ কম। কিন্তু স্কুলের পাঠ্যবস্তু একটি কিশোর মনকে কতটুকু দিতে পারে? নিশ্চয়ই তার একটা ভূমিকা আছে এবং সে ভূমিকাটা যথেষ্ট মূল্যবান। কিন্তু একটা কিশোর মনকে পরিপূর্ণ বিকশিত করে তোলার জন্যে তা যথাসর্বস্ব হতে পারে না। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক শুধু পাঠ্য বই হবে, এটা কেমন কথা?

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়িতে পড়াশুনোর এমন একটা পরিবেশ পেয়েছিলেন যেখানে বিদ্যালয়ের চেয়ে বিদ্যালয়ের বাইরের ভূমিকাটাই ছিল বেশি। এই অবস্থার মধ্যেই বিজ্ঞানচর্চা।

শৈশবে রবীন্দ্রনাথের জীবনে বারবার বিদ্যালয় পরিবর্তন ঘটেছে। ক্যালকাটা ট্রেনিং অ্যাকাডেমির শিশুশ্রেণীতে তাঁর বিদ্যালয় জীবনের সূচনা। সেখান থেকে তিনি গেলেন নর্মাল স্কুলে। এই নর্মাল স্কুলের আসল নাম 'ক্যালকাটা গবর্মেণ্ট পাঠশালা' বা ক্যালকাটা মডেল স্কুল। এখানেই রবীন্দ্রনাথের স্কুল জীবনের সবচেয়ে বেশি সময় কাটে।

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাস (পৌষ, ১২৭৬ সন) থেকে রবীন্দ্রনাথ নর্মাল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। বছর শুরুর আগেই বই কেনার ধূম। ক্যাশ বইতে আছে, ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর (৩ পৌষ) পদার্থবিদ্যা ও ওয়ান্‌স এরিথমেটিক কেনা হয়েছে। পদার্থবিদ্যা বইটির লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে।

বইটির পরবর্তী একটি সংস্করণের আখ্যা পত্রটিতে আছে: 'ELEMENTS / OF / NATURAL PHILOSOPHY / IN BENGALI / MATTER AND MOTION / BY UKKHOYCOOMAR DUTT. / ....../পদার্থবিদ্যা। / জড়ের গুণ ও গতির নিয়ম। শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত। / ......'

রবীন্দ্রনাথের মাত্র দশ বছর বয়সে যে বই তাঁকে পড়তে হয়েছিল, তার বিষয় সূচি সম্পর্কে সকলের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

বিষয় সূচিটি এই রকম: জড় ও জড়ের গুণ; পরমাণু; বিস্তৃতি; আকৃতি; স্থিতি-বিরোধ; বিভাজ্যতা; অনশ্বরত্ব; জড়ত্ব; আকর্ষণ; মাধ্যাকর্ষণ; বিষমযোগাকর্ষণ; কৈশিক আকর্ষণ; অন্তর্বাহ ও বহির্বাহ; রাসায়নিক আকর্ষণ; চৌম্বকার্ষণ; তড়িতাকর্ষণ; তেজ; পরিচালকতা; বিকিরণ; শোষকতা; বিয়োজন; সঞ্চারণ; আপেক্ষিক তেজ; নৈমিত্তিক গুণ; ঘনত্ব; কাঠিন্য; স্থিতিস্থাপকতা; ভঙ্গ প্রবণতা; ঘাতসহত্ব; তান্তবতা; ভিদাব রোধকতা; ভাসুরতা পাদন; সান্তরতা; বিস্তার্যতা; সঙ্কোচ্যতা; গতির নিয়ম; শক্তি; বেগ; সমগতি; সরলগতি; বিবৃদ্ধগতি; হ্রসমান গতি; অনপেক্ষ গতি ও আপেক্ষিক গতি; সাধারণ গতি; বক্র গতি; চক্রাবর্ত; ঘাত ও প্রতিঘাত; পরাবর্তিত গতি; মিশ্র গতি; ভার কেন্দ্র; জড় ও জড়ের গুণ; পরিদোলক।

এই বইটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমরা ইস্কুলে তখন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের এক ক্লাস নিচে বাংলা পড়িতেছি।... বাড়িতে অক্ষয়কুমার দত্তের পদার্থবিদ্যা শেষ করিয়াছি...। পদার্থবিদ্যা পড়িয়াছিলাম কিন্তু পদার্থের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না, কেবল পুঁথির পড়া—বিদ্যাও তদনুরূপ হইয়াছিল। সে সময়টা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছিল। আমার তো মনে হয়, নষ্ট হওয়ার চেয়েও বেশি; কারণ, কিছু না করিয়া যে সময় নষ্ট হয় তাহার চেয়ে অনেক বেশি লোকসান করি কিছু করিয়া যে সময়টা নষ্ট করা যায়।

কেন, রবীন্দ্রনাথের পদার্থবিদ্যার এই পাঠ নষ্ট হয়েছিল কেন? সম্পূর্ণ বই পড়ে শেষ করা হল—যেমন আজকাল স্কুলের ছেলেমেয়েরা পড়ে, এ তো সে রকমই পড়া। অথচ কাজের কাজ কিছু হল না—এটা কেমন কথা? আসলে এই পাঠের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনের কোন যোগাযোগ হয়নি। যদি এমন হত, পদার্থবিদ্যার প্রত্যেকটা পাঠই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখান হত, তিনি দেখছেন, বুঝছেন, তাঁর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, তা হলে তা তাঁর মনকে স্পর্শ করত। তখন শিক্ষা হত সম্পূর্ণ। সেই শিক্ষাতেই আনন্দ, সেই শিক্ষাতেই মুক্তি। রবীন্দ্রনাথ চিরকালই এ রকম শিক্ষার কথা ভেবে এসেছেন। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই।

অক্ষয়কুমার দত্তের যে পদার্থবিদ্যা, রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য থেকে মনে হয় না যে, তা নিয়মিত পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পাঠ্যসূচির বাইরেও বাড়িতে 'নানা বিদ্যার আয়োজন' ছিল। এই আয়োজনের উদ্যোক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ (১৮৪৪-৮৪ খ্রিস্টাব্দ)।

ছেলেবেলার লেখাপড়ায় তিনটি বালক একসঙ্গে অংশ নিয়েছিল। 'আমার দাদা সোমেন্দ্রনাথ, আমার ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ [গঙ্গোপাধ্যায়] এবং আমি'—হেমেন্দ্রনাথের নানা বিদ্যার আয়োজন এঁদের জন্যে।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, 'আমাদিগকে বিচিত্র বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য সেজদাদার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইস্কুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল বাড়িতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত।'

হেমেন্দ্রনাথ নিজে বিজ্ঞানচর্চায় অনুরক্ত ছিলেন। বাংলাতে বিজ্ঞানচর্চা করা হোক—এই অভিমত ব্যক্ত করে তিনি বাংলা ভাষায় কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। সে সব প্রবন্ধ তাঁর মৃত্যুর পরে 'পুণ্য' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। পরে 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম' শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ফলে নানা বিদ্যার আয়োজনে বিজ্ঞানের জায়গা যথেষ্ট ছিল।

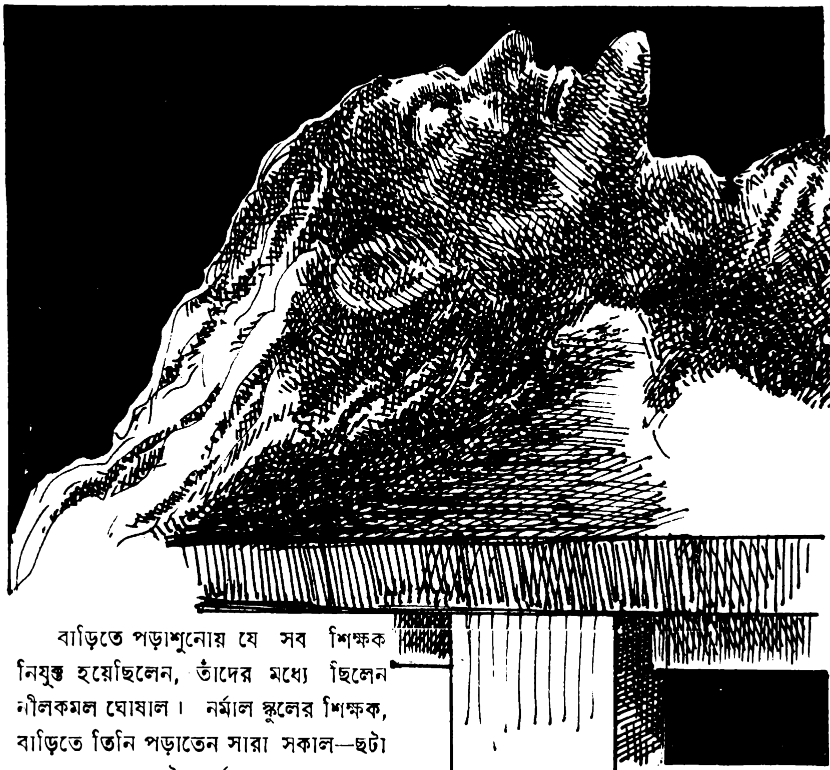

বাড়িতে পড়াশুনোয় যে সব শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন নীলকমল ঘোষাল। নর্মাল স্কুলের শিক্ষক, বাড়িতে তিনি পড়াতেন সারা সকাল—ছটা থেকে সাড়ে নটা পর্যন্ত। অক্ষয়কুমার দত্তের পদার্থবিদ্যা রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন এঁর কাছেই। তা ছাড়া সাতকড়ি দত্তের প্রাণি বৃত্তান্ত, রামগতি ন্যায়রত্নের বস্তুবিচার এঁর কাছেই পড়া। সাতকড়ি দত্তের প্রাণি বৃত্তান্তের প্রথম প্রকাশ ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে, বস্তুবিচারও প্রথম প্রকাশিত হয় ওই বছরই।

শৈশবে নানা বিদ্যার আয়োজনে আরও যে সব শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে তাঁর নিয়োগ, কিন্তু তিনি তখন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র।

'জীবন স্মৃতি'তে এঁর সম্পর্কে উল্লেখ আছে। একদিন তিনি কাগজের মোড়ক থেকে মানুষের একটি কণ্ঠনালী বার করে বিধাতার সেই আশ্চর্য সৃষ্টির কৌশল ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। 'আমার বেশ মনে আছে, ইহাতে আমার মনটাতে কেমন একটা ধাক্কা লাগিল। আমি জানিতাম, সমস্ত মানুষটাই কথা কয়; কথা কওয়া ব্যাপারটাকে এমনতরো টুকরো করিয়া দেখা যায়, ইহা কখনও মনে হয় নাই। কলাকৌশল যত বড় আশ্চর্য হউক না কেন, তাহা তো মোট মানুষের চেয়ে বড় নহে। তখন অবশ্য এমন করিয়া ভাবি নাই কিন্তু মনটা কেমন একটু ম্লান হইল; মাস্টারমশায়ের উৎসাহের সঙ্গে ভেতর হইতে যোগ দিতে পারিলাম না।……

তারপরে একদিন তি[illegible]গকে মেডিকেল কলেজের শবব্যবচ্ছেদের ঘরে লইয়া গিয়াছিলেন। টেবিলের উপর একটি বৃদ্ধার মৃতদেহ শয়ান ছিল; সেটা দেখিয়া আমার মন তেমন চঞ্চল হয় নাই; কিন্তু মেজের উপরে একখণ্ড কাটা পা পড়িয়াছিল, সে দৃশ্যে আমার সমস্ত মন একেবারে চমকিয়া উঠিয়াছিল। মানুষকে এইরূপ টুকরা করিয়া দেখা এমন ভয়ঙ্কর, এমন অসঙ্গত যে সেই মেজের উপর পড়িয়া থাকা একটা কৃষ্ণবর্ণ অর্থহীন পায়ের কথা আমি অনেকদিন পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।'

এই যে দেহের অংশবিশেষ একখণ্ড কাটা পা বা একটি কণ্ঠনালী, এর অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের মনকে অত্যন্ত পীড়িত করেছে। কেন? একটা অর্থহীন কাটা পায়ের পাশে পড়ে রয়েছে এক বৃদ্ধার মৃতদেহ। সে মৃতদেহ তো তাঁর মনকে তেমনভাবে নাড়া দিল না। অথচ একটা কাটা পা বা শুধু কণ্ঠনালী তাঁর মনকে এতটা পীড়িত করে তুলল!

আসলে বৃদ্ধার মৃতদেহ প্রাণহীন হলেও তা ছিল সম্পূর্ণ, অখণ্ডিত। শরীরের একটা বিচ্ছিন্ন অংশ তা নয়। আর রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বে, কাব্যে, চিন্তায়, এই অখণ্ডতাই হল মূল কথা। শবব্যবচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ যে টুকরো টুকরো কিছু নিদর্শন পেয়েছিলেন, ওই পরিবেশে অখণ্ডের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তার কোন সম্পর্ক দেখতে পাননি বলেই তাঁর মন ব্যথিত হয়ে উঠেছিল।

অথচ খণ্ডের সঙ্গে অখণ্ডের যোগই আমাদের প্রত্যাশা। সে যোগ যখন ঘটে, তখন তা হয় আনন্দের, তা হয় মুক্তির।

নদীর জলের সঙ্গে সাগরের লবণাক্ত জলের মিলন, খণ্ডের সঙ্গে অখণ্ডের এই যোগটুকু যেমন সকলের অভিজ্ঞতাতেই সুখকর, তেমনি রবীন্দ্র জীবনে শিক্ষায় এবং মানসিকতায় যেখানেই খণ্ডের সঙ্গে অখণ্ডের এই মিলনটুকু দেখা গেছে, সেখানেই তাঁর মন পরিতৃপ্ত হয়েছে, আনন্দ পেয়েছে। বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রটি রবীন্দ্র জীবনে যেখানে পরিপূর্ণতা পায়নি, সেখানে তা তাঁর মনকে ব্যথিত করেছে।

নানা বিদ্যার আয়োজনে যন্ত্রতন্ত্র সহযোগে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল। এই শিক্ষাটি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক ছিল। শিক্ষকের নাম ছিল সীতানাথ ঘোষ। তিনি ছিলেন বস্ত্র বয়নযন্ত্রের আবিষ্কর্তা। ২৫ বৈশাখ ১২৭৮ (রবিবার ৭ মে, ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে ও পরে আরও কয়েক দিন তিনি জাতীয় সভায় 'বিদ্যুৎ' সম্পর্কে আকর্ষণীয় বক্তৃতা দেন। পরবর্তীকালে বৈদ্যুতিক চিকিৎসার সাহায্যে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের ব্যাপারে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। সীতানাথ ঘোষ যন্ত্রপাতি সহযোগে বিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষা করতেন। এই সব পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কৌতূহল ছিল।

'জ্বাল দিবার সময় তাপ সংযোগে পাত্রের নিচের জল পাতলা হইয়া উপরে উঠে, উপরের ভারী জল নিচে নামিতে থাকে, এবং এই জন্যই জল টগবগ করে—ইহাই যেদিন তিনি কাচ পাত্রে জলে কাঠের গুঁড়া দিয়া আগুনে চড়াইয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন সেদিন মনের মধ্যে যে কিরূপ বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আজও স্পষ্ট মনে আছে। দুধের মধ্যে জল জিনিসটা যে একটা স্বতন্ত্র বস্তু, জ্বাল

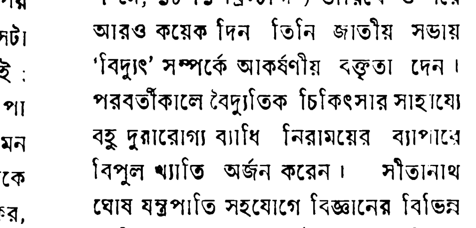

দিলে সেটা বাষ্প আকারে মুক্তিলাভ করে বলিয়াই দুধ গাঢ় হয়, এ কথাটাও যেদিন স্পষ্ট বুঝিলাম সেদিনও ভারি আনন্দ হইয়াছিল।'

অক্ষয় কুমার দত্তের পদার্থবিদ্যার পাঠ তাঁর কাছে একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেলেও, পদার্থবিদ্যার এই দুটি পরীক্ষা কিন্তু তাঁর মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়ে গেল। এ পরীক্ষায় তাঁর আনন্দ এবং পরিতৃপ্তি। ভৌত বক্তব্য এখন আর কেবল তত্ত্বরূপে রইল না, পরীক্ষিত সত্যের ভেতর দিয়ে পরিপূর্ণতার রূপ পেল। মনের সঙ্গে সেখানে তার মিলন। অপ্রাপ্তির দুঃখ ঘুচে গেল। প্রকৃতির রহস্য নিকেতনে প্রবেশ করার এই যে আনন্দের তিনি খোঁজ করে বেড়াতেন, তা বিচ্ছিন্নতার ভেতর দিয়ে নয়। তার লক্ষ্য সমগ্রতা। রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতার দৃষ্টিভঙ্গীটুকু বুঝতে পারলে তাঁর বৈজ্ঞানিক মনটিকে ঠিকভাবে ধরা সম্ভব।

'নানা বিদ্যার আয়োজন'-এর অন্তর্গত আর একটি শিক্ষার সূচনা হয় রবীন্দ্র জীবনের একাদশ বর্ষে। সেটি হল অস্থিবিদ্যা। অস্থিবিদ্যা চর্চায় একটি নরকঙ্কালও জোগাড় করা হয়েছিল। 'তার দিয়ে জোড়া একটি নরকঙ্কাল কিনিয়া আনিয়া আমাদের স্কুল ঘরে লটকাইয়া দেওয়া হইল।' [জীবনস্মৃতি]

এই কঙ্কালের স্মৃতি পরবর্তীকালে লেখা 'কঙ্কাল' গল্পের পটভূমি রচনা করেছে। সেই গল্পে আছে, 'আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম, তাহার পাশের ঘরের দেওয়ালে একটা আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলান থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলা খটখট শব্দ করিয়া নড়িত। দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত।'

রবীন্দ্র জীবনের ত্রয়োদশ বর্ষে রবীন্দ্রনাথ পিতার নিকটেও বিভিন্ন ধরনের পাঠ গ্রহণ করেন। চৈত্র ১২৭৯-এর শেষে অমৃতসর থেকে বেরিয়ে পাঠানকোট হয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ডালহৌসি পাহাড়ের বক্রোটা শিখরে এসে পৌছান সম্ভবত ১২৮০-এর বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়াতেই। হিমালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রায় প্রথমে বোলপুরে, পরে অমৃতসরে তিনি পিতার কাছে গ্রহ-নক্ষত্রের পাঠ নিয়েছিলেন। ১৪ বৈশাখ (শুক্রবার ২৫ এপ্রিল, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ) দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্র লেখেন, 'আমি অমৃতসর হইতে আবার সেই আমার বক্রোটা শিখরে আসিয়া পহুঁছি-

য়াছি।...রবীন্দ্র এখানে ভাল আছে এবং আমার নিকট সংস্কৃত ও ইংরাজি অল্প অল্প পাঠ শিখিতেছে।'

কিন্তু শুধু সংস্কৃত ও ইংরেজি নয়, ইংরেজি ও সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিদ্যারও পাঠ চলে। জ্যোতির্বিদ্যা দেবেন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় বিষয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের বোন স্বর্ণকুমারী দেবীও বাবার কাছে জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন। বাবার সম্পর্কে 'আমার জীবনস্মৃতি'তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও অনুরূপ কথা লিখেছেন।

শান্তিনিকেতনে থাকাকালেই দেবেন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল। 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ'-এ আছে 'সন্ধ্যাবেলা খোলা আকাশের নিচে বসে সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলের বিবরণ বলতেন আমাকে, আমি শুনতুম একান্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে। মনে পড়ে আমি তাঁর মুখের সেই জ্যোতিষের ব্যাখ্যা লিখে তাঁকে শুনিয়েছিলুম।' জীবন স্মৃতিতে তিনি বলেছেন, অমৃতসরেও তিনি Richard A. Proctor-এর লিখিত 'সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন। আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।' বক্রোটা যাত্রার পথে 'ডাকবাংলায় পৌঁছিলে পিতৃদেব বাংলার বাহিরে চৌকি লইয়া বসিতেন। সন্ধ্যা হইয়া আসিলে পর্বতের স্বচ্ছ আকাশে তারাগুলি আশ্চর্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত এবং পিতা আমাকে গ্রহ-তারকা চিনাইয়া দিয়া জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।' রবীন্দ্রনাথের এই অভিজ্ঞতার কথা 'বিশ্বপরিচয়'-এর মধ্যেও দেখতে পাওয়া যায়। 'বয়স তখন হয়ত বারো হবে...পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ডালহৌসি পাহাড়ে। সমস্ত দিন ঝাঁপানে করে গিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পৌঁছতুম ডাকবাংলায়। তিনি চৌকি আনিয়ে আঙ্গিনায় বসতেন। দেখতে দেখতে গিরিশৃঙ্গের বেড়া দেওয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলি যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম, জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।'

রবীন্দ্রজীবনের বৈশিষ্ট্য এই, তিনি যখন যা শুনেছেন, পড়েছেন বা শিখেছেন, যতক্ষণ না তা লিখে ফেলতে পেরেছেন, ততক্ষণ তা তাঁর হৃদয়ের সঙ্গে মিশে যায়নি। আর এই মিশে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর মন স্বস্তি পায়নি। তাঁর সাহিত্যজীবনে বারবার এই পরিচয় পাওয়া গেছে। দেবেন্দ্রনাথের কাছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের যে পাঠ তিনি নেন প্রথমে বোলপুরে, পরে অমৃতসরে এবং সব শেষে ডালহৌসি পাহাড়ে, তার ফল হিসেবে পরবর্তী বছরে তত্ত্বোবোধিনীতে পৌষ সংখ্যায় (১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ, ডিসেম্বর) 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সম্ভবত এই প্রবন্ধটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য প্রবন্ধ। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বিলাত যাবার আগে রবীন্দ্রনাথ সমুদ্র সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য যুক্ত অনেক বই পড়েন। জলপথে দীর্ঘদিন দিবারাত্র কাটাতে হবে, অথচ সমুদ্র সম্পর্কে অনবহিত থেকে যাওয়া রবীন্দ্রনাথের কাছে সঙ্গত বা স্বাভাবিক মনে হয়নি। তারই ফলশ্রুতি 'সামুদ্রিক জীব'। ১২৮৫ সন, বৈশাখের ভারতীতে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়।

এর পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিজ্ঞানের যে সম্পর্ক, তা দেখতে পাওয়া যায় জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার সময়ে। কিন্তু এই সখ্যতা স্থাপিত হওয়ার আগে তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের বই পড়েছেন, ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ আয়ত্ব করেছেন। আর যে বিদ্যা অধিগত হয়েছে, কাব্যেও যে তার ছাপ এসে পড়বে, তা স্বাভাবিক। ☐

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

'চাই শব্দ শব্দ চাই' এ সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না। পরবর্তী সংখ্যায় যথারীতি প্রকাশ হবে।
—সম্পাদক।

ছবি : তরুণ চক্রবর্তী

মজার ভূতের মজার গল্প

সর্বভূতেষু

সুকুমার ভট্টাচার্য

মুশকিল আসান ফকির মানুষ। পথে পথে ঘুরে বেড়ানই তাঁর কাজ এবং নেশা। সমস্ত দিন ঘুরতে ঘুরতে সন্ধের মুখে এসে পৌঁছেছিলেন টিকিয়াপাড়ায়। সামনে অন্ধকার রাত, বিশ্রামের দরকার। কিন্তু কোথায় আশ্রয় নেওয়া যায়? চারদিকে তাকালেন। চোখ পড়ল চৌধুরীদের পোড়ো দোতলা বাড়িটায়। এক নজরেই বুঝতে পারলেন পরিত্যক্ত। এই ভাল, কোন ঝামেলা ঝঞ্ঝাট নেই। সেখানেই আস্তানা নিলেন তিনি।

ফকির মানুষের খাওয়া দাওয়ার তেমন ঘটাপটা নেই। পোড়ো দাওয়ার এক কোণে চোখ বুজে আল্লার নাম নিতে নিতে অন্ধকার জাঁকিয়ে এল চারপাশে। তারপর হল চিড়েমুড়ির নৈশ আহার। সব শেষে ঝোলা থেকে বার করলেন একটা চাদর, পা থেকে মাথা পর্যন্ত মুড়ি দিয়ে সটান হলেন সেখানেই। চোখ দুটি টেনে এল ঘুমে।

কত রাত কে জানে। রাত দুপুর তো বটেই। যা কখনও হয় না, তাই হল মুশকিল আসানের। অসময়ে কাদের উঁচু গলার বাদানুবাদে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। মুখের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই নজরে এল না। উল্টে ভারি গলার চোখ রাঙানি কানে এল তাঁর, এবার পালাবে কোন

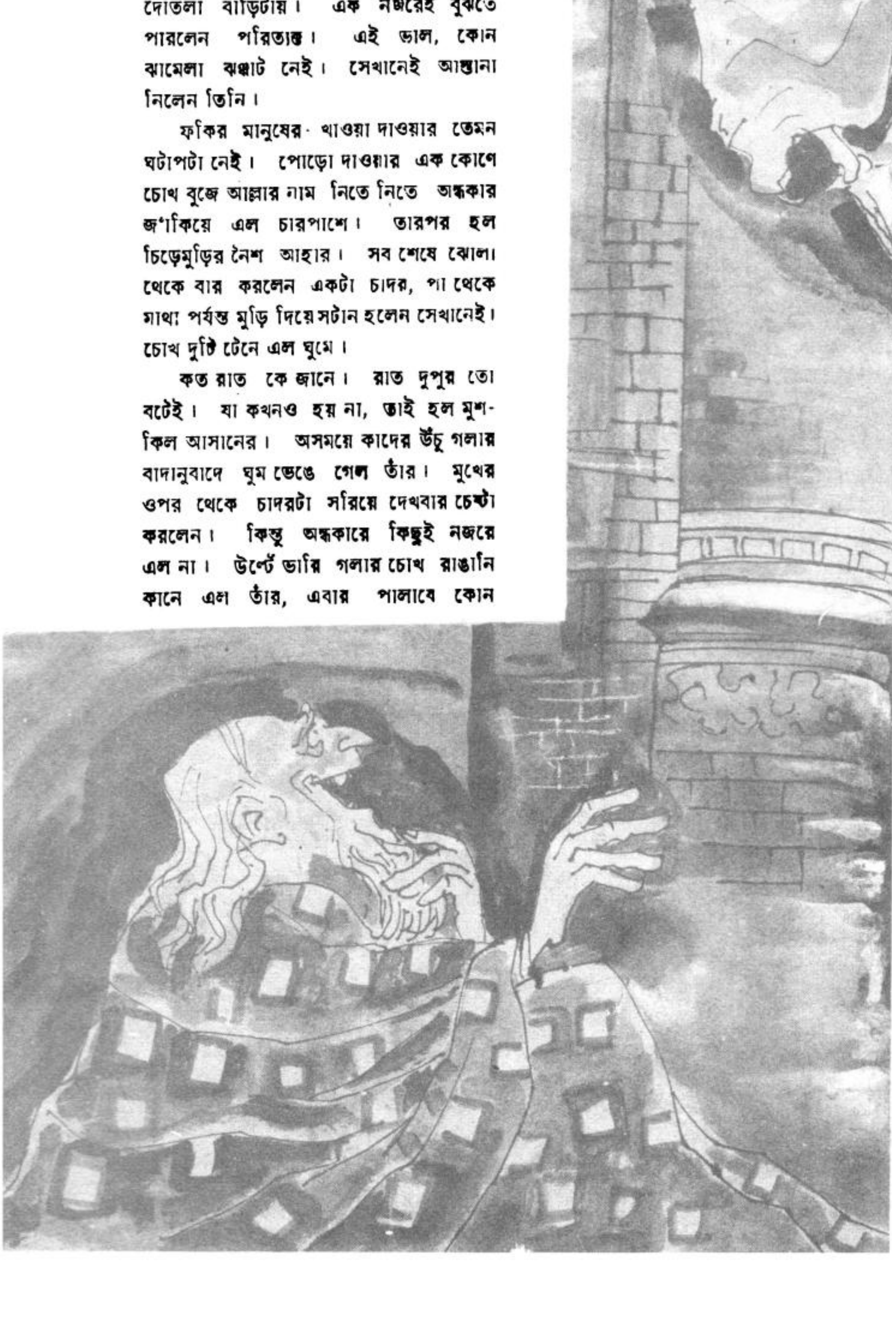

চুলোয়? বহুদিন পর তোমার পাত্তা পেয়েছি। আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন।

বটে? দাদার দেখছি ভীমরতি এখনো যায়নি! কি, কি করবেন কি আমার?— মিহি গলার পাল্টা বিক্রম, আপনি কি মনে করেন, আপনার ভয়ে এখানেও আমি কেঁচো হয়ে থাকব?

আমার ভয়ে তোমায় কিছুই হয়ে থাকতে হবে না। আমি এখুনি তোমার ঘাড় মটকে দফা রফা করে ছাড়ব।—ভারি গলার দৃঢ় সংকল্প।

তাই নাকি! ব্যাপারটা এতই সহজ নাকি? আপনি আমার ঘাড়টা মটকাতে আসবেন, আর আমি সেটাকে কচি লাউডগার মত এগিয়ে দেব, তাই ভেবেছেন নাকি?—মিহি গলাও কিছু কম যায় না, জ্যান্তে যেমন নাকে দড়ি দিয়ে কোর্ট ঘর করিয়েছি, মরার পরেও তেমন নাজেহাল করার হিম্মত রাখি।

কিন্তু ওরা কারা? মাঝরাতে অমন অশান্তিই বা শুরু করল কেন? উঠে বসলেন মুশকিল আসান, অন্ধকারে ঠাহর করার চেষ্টা করলেন।

মুখ সামলে কথা বলবে বেল্লিক, তোমার চোদ্দ পুরুষের ক্ষমতা কি, আমার নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাও?

দেখুন, ভাল হবে না বলছি! খবরদার বাপ চোদ্দপুরুষ তুলে কথা বলবেন না। তাঁরা আপনার বাড়ির চৌকাঠ পর্যন্ত মাড়াননি কোন দিন!

তা নাই বা মাড়াল। কিন্তু তারা যে কি ধরনের মানুষ ছিল, তা তোমার মত বংশধরকে দিয়েই বুঝতে পারছি।

ভারি গলার অভব্য মন্তব্য। রিনরিনে গলা মিহি প্রতিবাদ করে উঠল, উজবুকের মত কথা বলবেন না। এখন তাঁদের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়। তাঁদের মত ভাল মানুষ আমি ভূ-ভারতে দেখিনি।

এবার তাদের দেখতে পেলেন মুশকিল আসান। আর দেখার সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেল। দু-দুটো ভুত, মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা কালো চাদর মুড়ি দিয়ে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে। রোষ-ভরে হাত-পা নাড়ছে, আর হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লেগে আওয়াজ উঠছে খটাখট খট খট! কোটরগত চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে।

তারা ভাল মন্দ যাই হোক, তাতে আমার কি আসে যায়?—বলেই ভারি গলার ভুত লাফিয়ে পড়ল অন্যটির ওপর।

বট্‌-টে? এবার তবে ঠ্যালা সামলান।—বলেই পড়ো পড়ো অবস্থায় মিহি একটা প্যাঁচ কষে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই ধরাশায়ী।

মুশকিল আসান দেখলেন, দুটো অশরীরী ঝাপটা-ঝাপটি করে গড়াগড়ি যাচ্ছে মাটিতে। কখনও একজন ওপরে তো অন্যজন নিচে। আশপাশের বাতাস দ্রুত বয়ে চলল। পাঁচিলের ধারের গাছগাছালির পাতায় শন শন আওয়াজ উঠল। এ বলে আমায় দেখ তো, ও বলে আমায় দেখ। বিক্রমে কেউই কমতি নয়। লড়াই যখন বেশ তুমুল বলে মনে হল, তখন আর স্থির থাকতে পারলেন না মুশকিল আসান। চিৎকার করে উঠলেন, আহা করো কি, করো কি?

মুহূর্তে ঝটাপটি বন্ধ হয়ে গেল। মুশকিল আসান দেখলেন, কালো কাপড়ের মধ্যে নিজেদের আড়াল করে ভুতদুটি স্থির হয়ে গেল। তিনি বুঝলেন, এমন নিরালা জায়গায় হঠাৎ মানুষের গলা পেয়ে বেচারিরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে। এখন কি করবে কিছু ভেবে পাচ্ছে না।

তোমরা কারা? আর মাঝরাতে এমন মারামারিপিটই বা করছ কেন?

জবাব দেবে কি, তাদের অবস্থা সঙ্গীন যাকে বলে। চিরকাল শুনে এসেছে, ভুতকে মানুষ ভয় পায়। এ আবার কেমন মানুষ, যিনি ভুতকে পাল্টা প্রশ্ন করেন?

মুশকিল আসান এবার উঠে দাঁড়ালেন, কি হল? জবাব দাও? একেবারে জড়-পদার্থের মত অনড় হয়ে আছ যে? মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে অমন অনর্থ করছিলে কেন?

কালো কাপড়ের আড়াল থেকে কোন জবাব এল না। ভাল করে দেখবার জন্যে এগোতে যাবেন, এমন সময় ভারি গলার প্রশ্ন শুনতে পেলেন তিনি, কে আপনি? গায়ে পড়ে আমাদের বোঝাপড়ার মধ্যে মাথা দিতে এলেন কেন?

তবু ভাল, জবাব পাওয়া গেছে, ভাবলেন মুশকিল আসান। বললেন, আমার নাম মুশকিল আসান। যদিও অকারণে কারো ব্যাপারে আমার মাথা দেওয়া কাজ নয়। তোমরা ঝগড়া করে মাঝরাতে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছ।

এখানে কি করতে এসেছেন?

—কিছুই না। পথ চলতি মানুষ, রাত্তির-টুকু আশ্রয় নিয়েছিলুম এখানে।

সাধু সন্নিসি মানুষ?—মিহি গলার প্রশ্ন।

তা বলতে পারি না।—মুশকিল আসান জানালেন, তবে ঘরসংসার করি না। আল্লার নাম নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ানই আমার কাজ। কিন্তু তোমাদের কি ব্যাপার বল তো? ভূত-দশা পাবার পরেও এত দ্বন্দ্ব কিসের?

কোন জবাব নেই। কিছু পরে কালো কাপড়ের আড়াল থেকে ওদের পরামর্শ কানে এল তাঁর।

এ মানুষের কাছে বিচার চাইতে কিছু আপত্তি আছে তোমার?—ভারি গলার প্রস্তাব।

মিহি খেঁকিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, কিসের বিচার? আমি কোন অন্যায় করিনি, মিছি-মিছি বিচার চাইতে যাব কেন?

করেছ কি করোনি তা উনিই বলবেন—ভারি গলার পরামর্শ, ঝগড়া ঝামেলায় কারো না কারো মধ্যস্থতা কাজ দেয়। আর এসব ব্যাপারে সাধু সন্ন্যাসীরাই যোগ্য মানুষ।

অপর পক্ষের কোন জবাব নেই। মুশকিল আসানের মনে হল, মিহি বোধ হয় খতিয়ে দেখেছে মনে মনে। অনেক পরে মিহির জবাব শোনা গেল, বেশ। ওনাকে জিজ্ঞেস করেই দেখুন।

এবার কালো কাপড়ের ভেতর থেকে ভারি গলার কথা এল, আমাদের পরামর্শ নিশ্চয় আপনার কানে গেছে। এখন বলুন, আমাদের ঝগড়ার বিচার করতে আপনি কি রাজি? তাহলে আপনার কাছে সব কথা কবুল করতে পারি।

কৌতূহল বোধ করলেন মুশকিল আসান। জীবনে এ কাজ কখন করেননি এমন নয়, তবে ভুতুড়ে নালিশের সামনাসামনি হননি কখনও। বললেন, তা না হয় হল, কিন্তু বাদী প্রতিবাদীকে চোখে না দেখলে, কি করে বুঝব কার কথা সত্যি? তোমাদের উচিত বিচার পাবার আগে আমার সামনে এসে দাঁড়ান।

এর কি কোন প্রয়োজন আছে?—মিহি গলার প্রশ্ন।

আছে বৈকি। অনেক সময় বাদী প্রতি-বাদীর মুখভাবই প্রকাশ করে দেয়, কে সত্যি আর কে মিথ্যে বলছে। তোমরা যদি সামনে

না আসে বিচার করব কিভাবে ?

আবার কিছুটা নীরব রইল ওরা। শেষে ভারি গলা বলল, বেশ তবে তাই হোক।

কালো কাপড়ের আড়াল সরে গেল। মুশকিল আসান দেখলেন, হাড় নড়বড়ে দুটো কঙ্কাল ঈষৎ মাথা নিচু করে তাঁর সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

প্রমাদ গণলেন মুশকিল আসান। কঙ্কাল-দুটির দিকে তাকিয়ে কোন তফাতই তাঁর চোখে পড়ল না। দুজনেরই শাদা ধবধবে অবয়ব। হনুর ওপর কোটরগত দুটি চোখ। উন্মুক্ত দাঁতের সারি দুজনেরই সারি সারি সাজান।

আমার সব কথা শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন, ভারি গলার কঙ্কালটি মুখ খুলতেই মিহি গলার প্রতিবাদ রিন রিন করে উঠল, উঁহু ! আমায় আগে বলতে দিতে হবে।

পাছে আবার তর্ক তুমুল হয়, মুশকিল বাধা দিয়ে বললেন, তার আগে বল, তোমাদের নাম কি ? বাস কোথায় ?

আমি হলাম কাঁটাপুকুর-আড়ার অবনী বাঁড়ুজ্জ্যে। দিনতিনেক হল আমার লোকান্তর ঘটেছে।

ভারি গলার কথা শেষ হতেই, মিহি বলল, আমি ছিলাম ধরণীধর ঘোষাল। লোকান্তর অবশ্য আমার অনেকদিন আগে ঘটেছে। কাঁটাপুকুর-আড়াতেই ওনার বাড়ির নিচের তলাটায় ভাড়া ছিলাম।

বেশ। ভারি গলা, এবার তুমি বল, কি তোমার অভিযোগ ?—বলে ভাঙা দাওয়ার ওপর গুছিয়ে বসলেন মুশকিল। দেখাদেখি কঙ্কাল দুটিও উঠোনে পাশাপাশি উবু হয়ে বসল। ডান দিকের কঙ্কালটি হাত নেড়ে ভারি গলায় বলতে শুরু করল, আমার সব থেকে আফশোস, কি মহাপাপ করে ধরণীর মত কালসাপকে আমি বাড়িতে জায়গা দিয়েছিলাম।

গালমন্দ করবেন না। আমি তাহলে উঠে যাব।—মিহির প্রতিবাদ।

না না, আগেভাগে দোষারোপ করাটা খুবই খারাপ। যা সত্য তা সহজভাবে বলে যাও।—মুশকিল আসান বললেন।

দোষারোপ কি সাধে করি ? অনেক দুঃখে ওসব কথা মুখ দিয়ে বেরোয়। ভারি গলা বলে চলল, আজ থেকে কুড়ি একুশ বছর আগে, ওই ধরণীধর একদিন আমার কাছে এসে কেঁদে পড়েছিল। বাড়ির একতলাটা খালি পড়েছিল, ভাড়া নিতে চায়। দেশ থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করে তার পারছিল না, বৌ-ছেলেদের নিয়ে আসতে চায়। কি করি, বললাম, থাক। ভাড়া ধার্য হল পঁচিশ টাকা। তা বলব কি, আপনি ফকির মানুষ, আপনার কাছে মিথ্যে বললে আমার জিভ খসে যাবে। সেই যে ঢুকল, আর ওঠবার নাম করে না। ভাড়াও বাড়ায় না। দিনকে দিন ছেলেরা বড় হল, সংসারের আয় বাড়ল, আমার বাড়িভাড়া বেড়ে সর্বসাকুল্যে দাঁড়াল চল্লিশ টাকা। ভাল কথায় কত বুঝিয়ে বললাম, ধরণী, এখন তো আর তোমার সে অবস্থা নয়। ভাড়া কিছু বাড়াও। আরে বাপরে, শুনে বাবুর কি ফোঁসফোঁসানি। বলে, ভাড়া তো বাড়াবই না, বেশি বাড়াবাড়ি করলে কোর্টে গিয়ে জমা দেব। বুঝে দেখুন, বাজার চলতি ন্যায্য পাওনা চাইতে যাওয়ার কি বিপত্তি। শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই ও কোর্টে ভাড়ার টাকা জমা দিয়ে এল। বলুন, এরপর নিশ্চয় কোন ভদ্রলোক চুপ করে থাকতে পারে না। আমি যখন কিছু একটা বিহিত করব ভাবছি, তখন হঠাৎ কোর্ট থেকে সমন এসে হাজির। পরে জানলাম, ধরণী আমার নামে অভিযোগ করেছে, আমি নাকি তার ওপর যাচ্ছেতাই ব্যবহার করছি। ঘর রিপেয়ার করিনি, জল দিই না, ইলেকট্রিকের লাইন কেটে দিয়েছি, আরও কত কি ? বলুন তো, মিছিমিছি কি ফৈজত ! পাঁচবছর ধরে সেই মামলা চালাতে চালাতে বাবু একদিন স্ট্রোক হয়ে পটল তুললেন। আমি ভাবলাম, যাক বাঁচা গেল। ভালয় ভালয় রেহাই পেলাম বুঝি। ও বাবাঃ, তিনটি ছেলে রেখে এসেছে, তা তিনটিই কি রত্ন ? বাপের ফেঁদে যাওয়া মামলা তো চালালই, তার ওপর কি দাপট ? শুনলে অবাক হবেন, একটা রেকর্ড প্লেয়ার কিনেছে, দিনরাত্তির কানের গোড়ায় চলছে হিন্দি গানের জগঝম্প। টি ভি কিনেছে, তার এ্যান্টেনাটা রেখেছে ঠিক আমার শোবার ঘরের জানলার বুজু বুজু। শনিবার রবিবার হলে আর রক্ষে নেই, সমস্ত নিচের তলাটা সিনেমা হল হয়ে যায়। পাড়া-পড়শি জুটে একেবারে হৈ-হল্লা। বলতে গেলাম, এবার আর ওর ছেলেরা নয়, পড়শি-রাই আমাকে ধরে এই মারে তো, এই মারে। ভাবনায় চিন্তায় ধিক্কারে, শেষ পর্যন্ত শয্যাশায়ী হতে হল আমাকে। সে অসুখ আর আমার সারল না। মরার সময় তাই সঙ্কল্প করে-ছিলাম, আমি তো মরছিই। তারপর একবার যদি হতভাগাটার দেখা পাই, তা সে স্বর্গে হোক, নরকে হোক, আমি একবার দেখে নেব। আমার ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেব। পৃথিবীর মায়া কাটাবার পর আজ তিনদিন একেবারে হন্যে হয়ে আমি ওকে খুঁজে বেড়িয়েছি। আজ দেখা পেয়েছি ! এবার আপনিই বলুন, আমার মত উপকারী লোকের সঙ্গে এমন ব্যবহার করা ওর উচিত হয়েছে ?

ভারি গলার বক্তব্য শেষ হল। নীরব

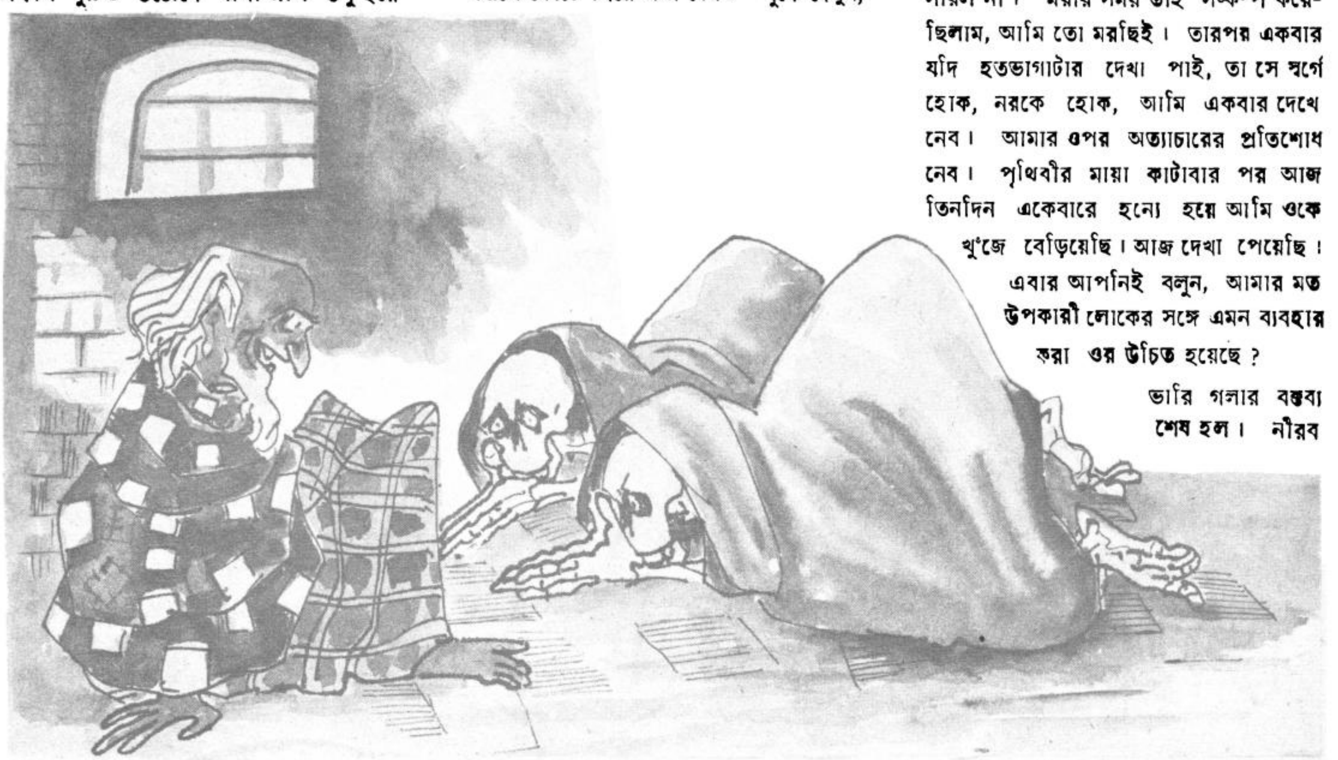

মুশকিল আসান। আর একজনের কথা না শুনে কোন মন্তব্য করা উচিত নয়।

নিজের কোলে ঝোল সকলেই টানতে পারে। —মিহি গলা বলতে শুরু করল, পৃথিবীতে উনিই যেন আমার একচেটিয়া উপকার করে গেছেন! আমি যেন ওনার কিছুই করিনি!

কি, করেছ কি শুনি? কি আমার ছাতা ধরে মাথা রেখেছ?

ভারি গলার প্রতিবাদ জোরদার হল। মুশকিল আসান সামাল দেবার চেষ্টা করলেন, আবার যদি এমন বাদানুবাদ শুরু কর, তাহলে আমার পক্ষে বিচার চালান অসম্ভব।

ভারি গলা চুপ হয়ে গেল। মিহি তার বয়ান শুরু করল, স্বীকার করি, এক সময়ে উনি আমার উপকার করেছেন। নিচের তলাটা আমায় ভাড়া না দিলে, বিলক্ষণ অসুবিধেয় পড়তে হত। কিন্তু ওনার উপকারও আমি কিছু কম করিনি। ওনার বাসায় ওঠার পরে পরেই ওনার মা মারা গেছিলেন। ওঃ, সে কি দারুণ জল-ঝড়ের রাত্তির! চিকিৎসা করাতে করাতে হাতের টাকা পয়সা সব শেষ হয়ে গেছিল ওনার। আমি সে রাত্রেই লোকের কাছ থেকে টাকা পয়সা ধার করে ওনার পাশে দাঁড়াই। কোন কিছুই টের পেতে দিইনি। তারপর এক বছরও গেল না, ভদ্রলোকের স্ত্রী মারা গেলেন। বাড়িতে এমন কেউ ছিল না, যিনি ওনাকে দু'বেলা দুমুঠো ফুটিয়ে দেন। আমার স্ত্রী, বুঝলেন কিনা, নিজের বড় ভাইয়ের মত দেখা-শোনা করেছেন ওনার। অবশ্য অনেকদিন পরে ভদ্রলোক আবার বিয়ে করেছেন। ঘরে এল এক ছোট্ট ফুটফুটে কন্যা সন্তান। তার আসা থেকে শুরু করে বিয়ে পর্যন্ত সমস্ত ঝামেলা ঝাক্ক, আমি আর আমার স্ত্রী বহন করে এসেছি বলতে গেলে। অতগুলো বছর আমরা ভুলেই গেছিলাম যে, আমরা এক ফ্যামিলি নয়। কিন্তু সেই মেয়ের বিয়ের পর কি হল ভগবান জানেন, দাদার আমার মতিগতি একেবারে বদলে গেল। কার বুদ্ধিতে আমি জানি না, দাদা যেন আমাদের পেছনে আড় হয়ে লাগলেন। উচ্চারণ করলে মরা মানুষও দাঁত খিঁচিয়ে উঠবে। জল দেবেন না, আলো দেবেন না, বাড়িতে আত্মীয় স্বজন এলে, ওপরতলায় শুরু হয় গজগজানি। সব কাজেরই মূল কথা, আমরা যাতে উঠে যাই। কিন্তু যাও বললেই তো আর যাওয়া যায় না। মনে মনে খুব কষ্ট হল, বুঝলেন? আমাদের এতদিনকার ভাব ভালবাসা, সুখ-দুঃখে একসঙ্গে ওঠা-বসা, এর কি কোন দাম নেই? ঠিক আছে, তবে তাই হোক। দিলাম কোর্টে মামলা ঠুকে। সত্যি কথা বলতে কি, ওনাকে কিভাবে উচিত শিক্ষা দেওয়া যায়, সেই চিন্তা-ভাবনায় আমার অকালে ব্লাড প্রেসার ধরে গেল। নইলে যে বয়সে আমার এই দশা ঘটেছে, তখনো কিন্তু আমার মরার বয়েস হয়নি। তবে আজ ওনার মুখে একথা শুনে খুব খুশি হলাম যে, আমার ছেলেরা তাদের বাবার ওপর অত্যাচারের যথেষ্ট প্রতি-কার করেছে।

করবে না কেন, বাপের সুপুত্তুর যে!—ভারি গলার টিপ্পনি।

সে তো বটেই। আপনি যে কেমন লোক, তা ইনি এখন বেশ বুঝতে পারছেন। না হলে মারা যাবার এতকাল পরেও আপনি আমার ঘাড় মটকাতে আসেন?

আবার পাছে লেগে যায়, তাড়াতাড়ি বাধা দিলেন মুশকিল আসান, আহা, থাম থাম। এমন করলে বিচার চলে? আমায় একটু ভাবতে দাও।

বাধ্য হয়ে চুপ করল দুজনে। পাশাপাশি প্রতীক্ষা। কে জানে বিচারের রায় কোন দিকে যাবে?

এদিকে ভাবছেন মুশকিল আসান। চোখ আকাশের গ্রহ নক্ষত্রের দিকে। শেষ পর্যন্ত হঠাৎ হেসে ফেললেন। উদার মনখোলা হাসি। ভূতেরা অবাক হয়ে মুখ তুলল।

আপনি হাসছেন! এতে হাসির কি আছে?—মিহি গলার অসন্তোষ।

আমি জানতাম, সাধু সন্নিসি মানুষরা সংসারি লোকের সুখ দুঃখের কোন দাম দেয় না।—ভারি গলার স্পষ্ট অভিযোগ।

অপ্রস্তুত মুশকিল আসান। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আমাকে সে রকম লোক ভেব না। আমি হাসছি অন্য কারণে। বলে গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। বললেন, দেখ, দোষেগুণেই মানুষ। অসময়ে তোমরা দুজনেই যে দুজনের উপকার করে-ছিলে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যেটা মানুষ মাত্রেই একে অপরের জন্যে করা উচিত। আবার দুজনেই দুজনের অপকার করেছ, যেটা কখনোই তোমাদের করা উচিত হয়নি। এবার আমি একটা প্রশ্ন করব, ভেবে উত্তর দাও। এই যে পোড়ো বাড়িটার দাওয়ায় আমরা রাত কাটাচ্ছি, কোন না কোন সময়ে এই বাড়িটা মানুষজনে জমজমাট ছিল। এখন তারা কোথায়?

প্রশ্নটা উদ্ভট বলে মনে হল তাদের কাছে। তবু মিহি জবাব দিল, মরে হেজে গেছে নিশ্চয়।

ঠিক বলেছ।—মুশকিল আসান বললেন, অথচ এই অট্টালিকাটা যিনি তৈরি করে-ছিলেন, তিনি হয়ত ভেবেছিলেন তার সন্তান-সন্ততিরা বংশানুক্রমে চিরকাল একইভাবে এটাকে ভোগ দখল করবে। তাই না?

হতে পারে।

কিন্তু তা হয়নি। কখনও তা হয় না। এমনটি ভাবাই ভুল। আবার দেখ, যুগ যুগ ধরে কত মানুষ আজকের সভ্যতার বনিয়াদ খাড়া করে দিয়ে গেছেন, তাঁরা আজ কোথায়? কেউ আছেন কি?

না।

কিন্তু তাঁদের কাজের সুফল আমরা ভোগ করছি। তাই নয় কি? বিশাল মহাকালের বিচারে, একটি মানুষের জীবনকাল আর কতটুকু? সেই সময়টুকু যদি পরস্পরের মধ্যে ভাব ভালবাসা বজায় রেখে কাটিয়ে দিতে পারতে, সেটাই ভাল হত নাকি?

হাসি হাসি মুখে তাকালেন মুশকিল আসান। মাথা নড়ে উঠল কঙ্কালদুটির। ভারি গলার মন্তব্য শোনা গেল, ফকির মানুষের উপযুক্ত কথাই বটে! ভিক্ষে করে যাঁর জীবন কাটে, তাঁর মুখে এমন কথাই মানায়।

তবু কোন বিরূপভাব দেখা দিল না মুশকিল আসানের মুখে। মুখের হাসিভাব বজায় রেখে বললেন, রাগ কর না। একটা সত্যি কথা বলছি। আমার কথায় তোমরা যখন কালো কাপড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলে তখন দেখলাম, তোমাদের দুজনের চেহারা একেবারে এক। দুজনেরই শাদা ধবধবে কাঠামো। কাউকেই আলাদা করে চেনা সম্ভব নয়। কেই বা অবনী বাঁড়ুজ্জ্যে আর কেই বা ধরণীধর ঘোষাল! অথচ হামবড়া ভাবটা পুরোপুরি বর্তমান।

একি বলছেন আপনি!—এই আমি হলাম অবনী বাঁড়ুজ্জ্যে।

একটি কঙ্কাল দু'পা এগিয়ে গেল মুশকিল আসানের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য কঙ্কালটি পেছন থেকে বলল, আমি হলাম ধরণী ঘোষাল।

মিষ্টি হাসি লেগেই রইল মুশকিল আসানের মুখে, আমার চোখে তোমরা দুজনেই এক। দুটোই শুধুমাত্র কঙ্কাল।

বলছেন কি? এও কি হয়?—ভারি গলার প্রশ্ন।

এমনিই হয়। এখন তোমাদের পরিচয়, তোমাদের কাজ, যা পৃথিবীতে করে এসেছ; তার বাইরে তোমাদের আর কোন অস্তিত্বই নেই।

মিহি বা ভারি, কারো মুখে কোন কথা নেই। অনেকক্ষণ তারা একে অন্যের মুখের দিকে বোকার মত চেয়ে রইল। কি ভাবছিল তা ওরাই জানে। একসময় দুজনেই হাত জোড় করল। ভারি বলল, মাফ করবেন। মিছিমিছি মাঝরাতে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত করলাম। ব্যাপারটা ঠিক এভাবে ভেবে দেখিনি।

বলে কয়েকপা একসঙ্গে পিছিয়ে গেল তারা। তারপর হুশ করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল দুজনে। মুশকিল আসান আর কাউকেই দেখতে পেলেন না। □

ছবি: লাহিড়ী

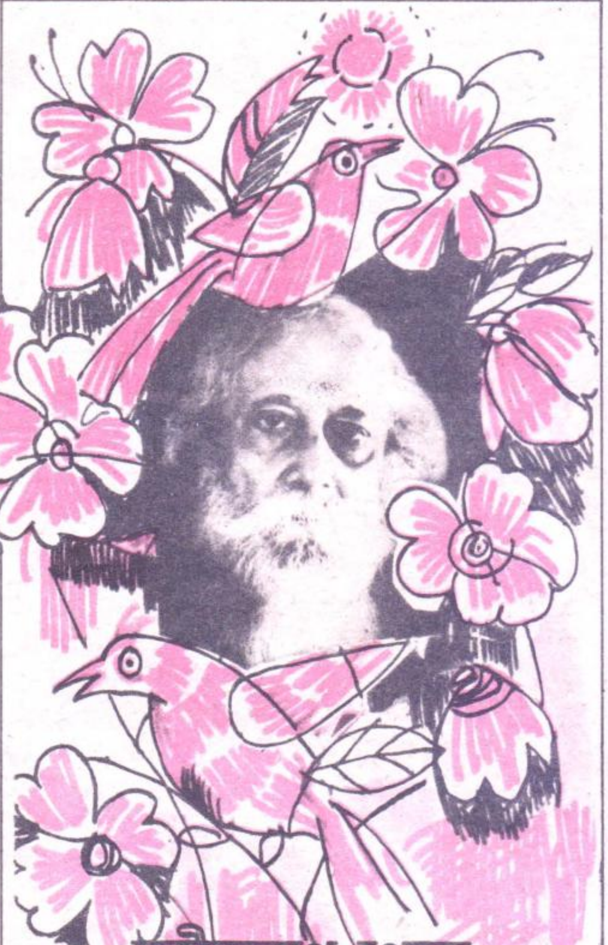

রবীন্দ্রনাথ থেকে

অশোককুমার মিত্র

গাছ বললে ডালকে ডেকে,
পারিস দিতে কুঁড়ি ?
ডাল বললে, ফুটিয়ে দেব
কুসুম ঝুরি ঝুড়ি।
রাত বললে আকাশটাকে,
পারিস দিতে ভোর ?
বললে আকাশ সোনালী ভোর
ক'খানা চাই তোর ?
বনের পাখি বললে ডাকি
গাইতে পারি সুরে,
রামধনু রঙ মাখিয়ে রাখা
আকাশখানা জুড়ে।
কেমন করে এসব পারি ?
বললে ওরা ডেকে,
সুর নিয়েছি, রঙ নিয়েছি
রবীন্দ্রনাথ থেকে।

ছবি : রাজা

পাখি

প্রণব মুখোপাধ্যায়

শূন্যেতে দোল দুলিয়ে দিয়ে
লালচে দেহের ঢং—
বনপলাশে রং মিলিয়ে
মিলিয়ে গেল রং।
ভোরের বাতাস পাতায় ছোটে
শুনছি অহর্নিশ,
রোদ চিকচিক ছোট্ট ঠোঁটে
উঠল খুশির শিস্।
ডাকটি শুনে চোখ তুলে চাই
খুঁজতে থাকি ঠাঁয়,
তুই খুঁটে খাস্ ধানের মরাই
ঘরের আঙিনায়।
আবার দেখি রঙের ঝিলিক
রিক্ত ধূধূ মাঠ—
হয়নি জানা নামটা তো ঠিক
হায় কি যে ঝঞ্ঝাট।
স্বপ্ন রঙিন মুক্ত ডানা
বিষণ্ণ নীল বুক
সার বুঝেছি তুই অজানা
সেই অচেনা সুখ।

তোমার আত্মজিজ্ঞাসা জেগেছে। এতেই তুমি শক্তিমান হয়ে উঠবে। আর লালন প্রয়োজন নেই। তাই আমি নিয়ে যাব তোমার জননীকে।
এত তেজ সংবরণ কর। জ্বলে গেলাম…
মা ?
নেই।
সূর্যদেব চলে গেছেন ?
যাবার আগে দিয়ে গেছেন এই আদিত্যশিলা। এই শিলা তোমাকে বিশ্বজয়ী করবে।

দেখতে দেখতে কেটে গেল আরও অনেক কাল।
গায়েব এখন যুবক। গায়েবী অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যা।
আত্মবিস্মৃত হয়ে বসে কেন গায়েব! ওঠ। পর যোদ্ধৃবেশ।
সূর্যকুণ্ডের সামনে হাত বাড়িয়ে গায়েব। কুণ্ড থেকে উঠছে সপ্তাশ্ব রথ।
সূর্যদেবের নির্দেশে গায়েব ডাকতেই কুণ্ড থেকে উঠে এল যুদ্ধরথ। গায়েব যুদ্ধযাত্রা করল।

এরপর ৪৬ পৃষ্ঠায়

কোটাল

অরুণ আইন

শহরটা মফঃস্বলে। কিন্তু শহরের অবস্থা থমথমে ভয়ঙ্কর। শহর শাসন করে দুজন সমাজ-বিরোধী গুণ্ডা। একজন শহরের পশ্চিম আর একজন পুব—এইভাবে দুজন শহরটাকে ভাগ করে নিয়েছে। আজ একমাস যাবৎ এই দুজন দুজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। হয়,—এ থাকবে না হয়,—ও। আর ভাগাভাগি নয়—শহরের দখল নেবে যে কোন একজন। যুদ্ধ হচ্ছে চোরাগোপ্তা, কখনো প্রকাশ্যে। আজ এ হয়ত দু জীপ ভর্তি লোক নিয়ে ওর এলাকা আক্রমণ করল। হাতে স্টেনগান, রিভালবর, বর্শা, তরোয়াল। বিপক্ষের ঘাঁটিতে আচমকা হানা দিয়ে পাঁচ-ছটা লাশ ফেলে পালিয়ে এল। কাল অপরজন এল পাঁচ লরী ভর্তি গুণ্ডা নিয়ে। নিয়ে এসে বিভৎস রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিয়ে গেল। এইভাবে চলছিল। কোটাল পুবের গুণ্ডার দলে। ইনফরমার। মাসখানেক পরে দেখা গেল পুবের জন আস্তে আস্তে মাটি ছাড়ছে। হারছে। পশ্চিমের জন প্রবল প্রতাপে এদের প্রায় কোণঠাসা করে এনেছে।

কমতে কমতে প্রায় পাঁচ জনে এসে দাঁড়িয়েছে এরা। এ পক্ষের যে দলনায়ক সে গত তিনদিন আগের আক্রমণে মারা গেছে। দলের মাথারা প্রায় সবাই শেষ। শুধু কোটাল আর কোটালের মত বাড়তি পড়তি কজন এখনও আতঙ্কে, ভয়ে, ধুক ধুক করে পালিয়ে বেড়ান কুকুরের মত বেঁচে আছে।

সেদিন রাত। সমস্ত শহর আতঙ্কের কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে ধুকছে। গৃহস্থরা সন্ধ্যে থেকেই দরজা দিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। কোটালরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে একটু আশ্রয় প্রার্থনা করেছিল, কেউ দেয়নি। দেবে, এমন সাহস কার আছে। আর দেবেই বা কেন। গুণ্ডাদের কেউ বাড়িতে আশ্রয় দেয়! যখন কোটালদের দলের দিন ছিল, তখন ওদের ওপর কম অত্যাচার করেনি ওরা। তখন কোটালরা যা বলেছে ভয়ে ভয়ে তাই শুনেছে গৃহস্থরা। কিন্তু আজ কোটালদের দিন গেছে। আজ প্রচণ্ড শীতের রাস্তার রোঁয়া ওঠা নেংটি কুকুরের মতই ওরা আশ্রয়হীন অসহায়।

শেষ অবধি চিরঞ্জীবের চায়ের দোকানে আশ্রয় মিলল ওদের। চায়ের দোকান মানে, চারদিকে বাঁশের দরমার বেড়া দেয়া আর টিনের চাল দেয়া একটা নড়বড়ে শতচ্ছিদ্র ঘর। ঘরের ভেতরে ততোধিক নড়বড়ে কতগুলি কাঠের টেবিল আর বেঞ্চ। আর পেছন দিকে একটা মস্ত আগুণের ভাটী। যেখানে ভোর চারটে থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত চা আর জিলিপী ভাজা হয়।

আজকাল অবশ্য আর হয় না। যখন শহরে জীবন ছিল, স্বাভাবিক ছিল অবস্থা তখন হত। এখন সন্ধে থেকেই ঝাঁপ বন্ধ করে চিরঞ্জীব আর তার গুটিকয় কারিগর আর ছোকরা চাকর ভেতরে গুটিসুটি মেরে ভোরের প্রতীক্ষা করে। কোটালরা ওই ভাটীর পাশে আশ্রয় পেল।

রাত বোধহয় তখন দুটো কি আড়াইটে হবে। সেই সময় শেষ আক্রমণ এল। চারদিকে আর্তচিৎকার। গুণ্ডাদের হা হা রব। গুলির শব্দ। চারদিকে নারকীয় তাণ্ডব। ভাটীর পাশে বসে এরা পাঁচজন তখন ঠক ঠক করে কাঁপছে। এদের খুঁজে পেতে খুব একটা দেরি হল না ওদের। কিছুক্ষণের মধ্যেই শাবলের বাড়ী পড়ল দরমার ছেঁচা বেড়ায়। বীভৎস চেহারার গুণ্ডারা হাতে রক্ত টপ টপ করে পড়া তরোয়াল নিয়ে লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকল। ঢুকেই যাকে যেখানে পেল ঝপাঝপ কাটতে লাগল। নিষ্ঠুরভাবে, কোন দয়ামায়া নেই।

কোটাল ভাটীর পাশ থেকে লাফ দিয়ে ভাঙা দরমা পেরিয়ে বাইরের অন্ধকারে পড়ল। তারপর সামনের অন্ধকার ভেদ করে ছুট দিল। পেছনে হাহা করা তরোয়াল নিয়ে পাঁচ ছ-জন লোক তাড়া করল। কোটালের মনে হল সামনে অনন্ত পথ। অন্ধকারে ঢাকা, পীচ ঢালা পথ। কোটাল প্রাণপণে দৌড়চ্ছে। পেছনের লোকগুলিও নাছোড়-বান্দা। কোটালের জিভ বেরিয়ে আসছে। দৌড়তে দৌড়তে ভোর হয়ে আসছে প্রায়। কোটাল আর পারছে না।

এমন সময় পথের পাশে দেখল, চারপাশে ফুল আর হেজ গাছ দিয়ে ঘেরা কী সুন্দর একটা বাড়ি! কোটাল চোখ তুলে তাকাতে দেখল, সেটা একটা স্কুল। কী স্কুল ঠিক খেয়াল করতে পারল না। লোহার গেট খুলে কোটাল মরিয়া হয়ে তার ভেতরেই ঢুকে পড়ল। ঢুকতেই সুড়কি ঢালা লাল কোয়ারি করা সুন্দর পথ। দুপাশে অজস্র ফুলের বাগান। সরু লাল পথটা সোজা চলে গেছে স্কুল বাড়ির মধ্যে। কোটাল দৌড়ে সেই পথটুকু পেরিয়ে আসতেই দেখল সামনের ঘরটায় লেখা আছে, 'হেডমাস্টার'।

দরজায় সাদা পর্দা ঝুলছে। কোটাল বাঁচার জন্য হুড়মুড় করে পর্দা ঠেলে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে একজন প্রবীণ মানুষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কোটাল তাঁর পায়ের কাছে ছিটকে পড়ে কেঁদে ফেলল, স্যার, আমাকে বাঁচান। আমাকে বাঁচান।

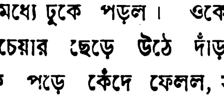

দুই

ঠিক এইখানে কোটালের ঘুম ভেঙে গেল। কুলকুল করা ঘামে সমস্ত ফুটপাত ভিজে গেছে। কোটাল উঠে বসল। সমস্ত গায়ে কেমন ব্যথা। প্রচণ্ড জল তেষ্টা পাচ্ছে। ঠিক এই স্বপ্নটা কোটাল দুবছর ধরে দেখতে শুরু করেছে। আজ নিয়ে চারবার দেখল। হুবহু একই রকম, একই অনুপুঙ্খ। প্রতিবারই স্বপ্নটা দেখার পর কোটাল বেশ আশ্চর্য হয়। স্বপ্নটার মাথা-মুণ্ডু কিছু বুঝতে পারে না ও। স্বপ্ন এমন খুচখাচ ও আরো অনেক দেখেছে। কিন্তু দেখার পরই, ঘুম ভাঙার পর মনে করতে পারে না কি দেখেছে। কিন্তু এই স্বপ্নটার কথা ও অনুপুঙ্খ সমস্ত মনে করতে পারে। আর এমন একটা নিটোল আগাগোড়া মস্ত স্বপ্ন কোটাল এটা ছাড়া আর অন্য কিছু দেখেনি কোনদিন।

ফুটপাতে সার সার আরো অনেক লোক শুয়ে আছে। কোটালের ডান পাশে শোয় রিক্সায়ালা দীননাথ। বাঁপাশে এতদিন শুত ছাতুয়ালা রামভক্ত। আজ কতদিন ধরে ও আসছে না, ওর জায়গাটা দখল করেছে আনোয়ার। আনোয়ার সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে।

রাত এখন ঘুটঘুট করছে। এখন কটা বাজে কোটাল বুঝতে পারল না। আকাশে তারারা ঝকঝক করছে—একমুঠো রূপালী খইয়ের মত। তারার দিকে চেয়ে কোটাল বুঝল রাত এখন আর খুব বেশি দেরি নেই। কোটাল জানে,তারারা যত বেশি উজ্জল হয়ে ওঠে রাতের আয়ু তত কমে আসে।

কোটাল আর বসে থাকতে পারছে না। তেষ্টায় গলা কাঠ। সামনের পার্কের মোড়ে কর্পোরেশনের কল আছে। এত রাতে কলে জল নেই। কিন্তু ছোট একটা রবারের নল ভেতরে ঢুকিয়ে মুখ দিয়ে টানলে জল আসে। কোটাল ওর চট দিয়ে মোড়া বালিশের ভেতর থেকে দেড় হাত লম্বা সরু একটা প্লাস্টিকের নল বের করল। তারপর সেটা হাতে নিয়ে উঠে পড়ল।

কলের মুখে প্লাস্টিকের নলটা ঢুকিয়ে সবে কোটাল মুখে দিয়ে জল টানতে শুরু করেছে এমন সময়, দুম করে ওর পিঠে কেউ লাথি ঝাড়ল। কোটাল ওর ছোট্ট দেহটা নিয়ে দুহাত দূরে ট্রাম রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ল। কি হল প্রথমটা কিছু বুঝতে পারল না কোটাল। ট্রাম লাইনের ওপর পড়ে ঘাড়টা ঘোরাতে দেখতে পেল, কজন হ্যাকশ দিয়ে পার্কের লোহার রেলিং কাটছে। ভুলটা কোথায় কোটাল এতক্ষণে বুঝতে পারল। এই সময় এখানে আসা উচিত হয়নি। তেষ্টার ঘোরে কোটাল ঠিক খেয়াল করেনি। তা না হলে রাত্রে রাস্তাঘাটে চলতে হলে কোটাল চোখ-কান খুলে চলে। আগে ওদের ওপর চোখ পড়লে কোটালের হাজার তেষ্টা পেলেও এদিকে ভীড়ত না। কিন্তু এতক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। দুটো বিরাট চেহারার লোক এসে কোটালকে তুলে ধরে এলোপাথাড়ি চড় ঘুষি মারতে লাগল। মারতে মারতে মুখে রক্ত তুলে কোটাল যখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলল তখন, ওরা কোটালকে ওপাশের ফুটপাতে ছুড়ে ফেলে দিল। তারপর আবার হ্যাকশ তুলে নিয়ে রেলিং কাটায় মন দিল।

তিন

জামশেদপুরের ১০ নং বস্তির একটা খোলার ঘরে থাকত কোটালরা। ওর বাবা একটা সিনেমা হলে কাজ করত। বুকিং ক্লার্ক। কোটালরা ছিল তিন ভাইবোন। কোটালই বড়। ওর নিচে আরো দুটো বোন ছিল। সবচেয়ে ছোট বোনটির বয়স মাস ছয়েক। তার ওপরের বোনটির বয়স বছর চার। আর কোটালের তখন ছ বছর। কোটাল সিদ-গোড়া বিবেকানন্দ স্কুলে পড়ত। ক্লাস টুয়ে। ওয়ান থেকে টুয়ে উঠতে কোটাল ফার্স্ট হয়েছিল। ক্লাস টুয়ের ফাইনাল পরীক্ষার মাস কয়েক আগে ওর বাবা একদিন বাড়ি ফেরার পথে টিনপ্লেট কারখানার ইয়ার্ডিং-এ রেলে কাটা পড়ে মারা গেল।

তার ঠিক মাস খানেক পর কোটালের মা একদিন পান্তা ভাতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে ওদের ভাইবোনদের খেতে দিল। নিজেও খানিকটা নিল। ছ মাসের বোনটাকে মা জোর করে ঠেসে ঠেসে সেই ভাত খাওয়াল। তারপর নিজেও খেল পেট ভরে। রাতের মধ্যেই বোন দুটো মারা গেল। মা মারা গেল পরদিন সকালে হাসপাতালে। কোটাল বমি করতে করতে আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেল। পাড়ার লোকেরা বলল, রাখে হরি মারে কে!

কোটাল সেই ওইটুকু বয়েসেও 'হরি' নামক ভদ্রলোকের আশ্চর্য ক্ষমতায় মুগ্ধ হল।

কোটালের এক মামা থাকেন কলকাতায়। খবর শুনে তিনি এসে নিয়ে গেলেন কোটালকে তার কাছে। কোটালের মামা কনট্রাক্টারী ব্যবসা করেন। বিরাট বড়লোক। কলকাতায় নিজের বাড়ি আছে,

গাড়ি আছে। কিন্তু মামার কোন ছেলেমেয়ে নেই। কোটাল ভাবল, মামা মামীর কাছে ও নিজের ছেলের মত থাকতে পাবে।

কলকাতায় আসার ঠিক দুদিন পর মামা কোটালকে বললেন, চল বেরই।

কোটাল ভাবল মামা বোধহয় তাকে স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে যাচ্ছেন। মামার পেছন পেছন খুশি মনে বাড়ি থেকে বেরুল। গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে বসল কোটাল।

কিছুক্ষণ পর কোটাল অবাক হয়ে দেখল, মামার গাড়ি কোন স্কুলে নয়, একটা গ্যারেজের পাশে এসে দাঁড়াল।

মামা গাড়ি থেকে নেমে এসে কোটালকে ডাকলেন, নেমে আয়।

কোটাল মামার পিছু পিছু নেমে এল। বিরাট গ্যারেজ। চার পাশে অসংখ্য পুরনো মোটর দাঁড়িয়ে আছে। সারান হচ্ছে। গ্যারেজের মালিক একজন পাঞ্জাবী। তাকে দেখেই কোটালের ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। মামা অফিসে গিয়ে সেই পাঞ্জাবীটার সঙ্গে দেখা করলেন,— সিংবাবু এই ছেলেটির কথা আপনাকে বলেছিলাম। গরীবের ছেলে, দেখুন যদি গড়ে পিটে মানুষ করে দিতে পারেন। গাড়ির কাজ শিখতে পারলে কোন দিন না খেয়ে মরবে না।

সিংবাবু বিগলিত হেসে বলল, সে আপনি কোনো চিন্তা কোরবেন না বোস সাহাব। আপনার রেকমণ্ডি আদমীকে হামি একদম দুরস্ত করে দিবো।

মামা এবার কোটালের দিকে ফিরে বললেন, এখন থেকে তুই এখানেই থাকবি, বুঝলি। মন দিয়ে কাজ শেখ। সিংবাবু যা বলবেন শুনবি। এখন দুবেলা শুধু খেতে পাবি। পরে কাজ শিখলে আস্তে আস্তে দশ-বিশ টাকা মাইনে দেবে।

কোটালের গলার কাছে কি যেন একটা দলা পাকিয়ে আটকে যাচ্ছিল, বলল, মামা, আমি বাড়ি যাব।

মামা, আমি বাড়ি যাব

মামা হেসে বললেন, বাড়ি গিয়ে কি করবি। সেখানে তোর মামী তোকে বাড়ির কাজ করাবে। বাড়ির চাকর হওয়ার চেয়ে মোটর মেকানিক হওয়া ভাল। মামা উঠছিলেন। সিংবাবু বলল, একটু চা পিয়ে যান বোস সাহাব।

মামা বসলেন না। উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, না সিংবাবু, একটু সাঁতরাগাছির দিকে যেতে হবে। ওখানে একটা বিরাট কনট্রাক্ট নিয়েছি। গতকাল কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। আজ আমার সাইটে না গেলেই নয়। নটার মধ্যে পৌঁছতে হবে। সিংবাবু বিগলিত হয়ে বলল, আপনার এত পয়সা খাবে কে, বোস সাহাব। লেড়কা-লেডকী তো কুছু নেই আপনার। কথা শুনে মামা হাসলেন। তারপর বললেন, পয়সা কারো বেশি

হয় সিংবাবু ! এটা কী বললেন। আচ্ছা আজ চলি। আর একদিন এসে চা খেয়ে যাব। চলিরে কোটাল। মন দিয়ে কাজকর্ম কর, দেখ যদি উন্নতি করতে পারিস।

মামা গাড়িতে উঠে চলে গেলেন।

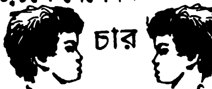

চার

মামা চলে যেতে কোটালের খুব কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু কাঁদল না। জীবনে এই প্রথম ও এতগুলি অপরিচিত লোকজনের সামনে এল। এখন তাকে এদের সঙ্গেই থাকতে হবে। কেন থাকতে হবে কোটাল বুঝতে পারছিল না। সামনের ওই সিংবাবুকে কোটালের প্রথম থেকেই খুব ভয় হচ্ছিল। লোকটার সারা মুখে দাড়ি। মাথায় পাগড়ী। একটা চোখ নেই। পাহাড়ের মত লম্বা আর মোটা। গায়ে একটা লম্বা নোংরা পাঞ্জাবী আর পাজামা।

বাবা আর মার ওপর খুব রাগ হচ্ছিল কোটালের। এক মাসের মধ্যে হঠাৎ কোথা থেকে কী হয়ে গেল। বাবা, মা বোনদের আর কাউকেই ও কোনদিন দেখতে পাবে না। কোথায় যেন চলে গেল ওরা লোকের কাঁধে চেপে ! তারপর মামাকে দেখে ও একটু সাহস পাচ্ছিল। মামা মামীমাকে ও ছোট থেকে দেখেছে। চেনে ওদের। মা বলত, ভয় নেই। আমি মরলে তোদের মামা আছে। মামা তোদের দেখবে।

কথাটা শুনে শুনে কোটালের একটু বিশ্বাসও হয়েছিল। কিন্তু সেই মামা হঠাৎ তাকে যে কেন এমন একটা বিশ্রী লোকের কাছে রেখে চলে গেল কোটাল বুঝল না।

মামা চলে যেতে সিংবাবুর এবার কোটালের ওপর নজর পড়ল। লোকটা এক চোখে বাঘের মত চায়। কোটালকে ডাকল, ইধারে আয়।

ডাক শুনে কোটালের পিলে চমকে যাবার জোগাড়। আড়ষ্ট পায়ে দু পা এগোল।

লোকটা এবার ধমকে উঠল, কাছে আয় শুয়োরের বাচ্চা।

কোটাল তাড়াতাড়ি কাছে এগোল।

কাছে যেতে লোকটা ওর গা টিপে টিপে দেখতে লাগল। বলল, দেখছি তোর গায়ে কত মাংস আছে। খাটতে পারবি কেমন।

বলে লোকটা খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগল। তারপর আচমকা খ্যাক করে কোটালের পেটের চামড়া চিমটি দিয়ে ধরল, ভাত খাস কতটা। বাঙ্গালী ছোকরারা খালি খাবার বেলায় এত ভাত খায় কামের বেলায় ঢুঢু। রাত্রে স্রিফ দুটো রুটি পাবি, বুঝা

লোকটা পেটের চামড়া তখনো খামচে ধরে আছে। যন্ত্রণায় কোটালের মাথা অবধি টনটন করছে। কিন্তু কাঁদল না। কোটালের আর কান্না পাচ্ছে না। শুধু নিঃশব্দে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ বুঝেছে।

সিংবাবু এবার পেটের চামড়া ছেড়ে দিল। জিজ্ঞাসা করল, নাম কি তোর ?

—কোটাল রায়।

—হুঁ। কোন রাজার কোটাল আছিস তুই ? বলে নিজের রসিকতায় নিজেই মিট মিট করে হাসতে লাগল।

—এর আগে কোথাও কাম করতিস ?

কোটাল মাথা নাড়ল। কোথাও করত না।

—একদম নবীস আছে। ঠিক আছে। কামে লেগে যা। কিন্তু কোনদিন যদি কুছু চোরি করে ভাগার মতলব করিস তবে মেরে খাল খিঁচে লিব, বুঝেছিস।

খাল খিঁচে নেওয়া মানেটা কি কোটাল বুঝতে পারল না। কিন্তু তবু ঘাড় নাড়ল, অর্থাৎ বুঝতে পারছে ও সব।

সিংবাবু ডাকল, আবদল, এ আবদুল।

কিছুক্ষণ পর সর্বাঙ্গে কালিমাখা একজন লোক এসে ঘরে ঢুকল। সিংবাবু বলল, এ বাঙ্গালী ছোকরাকে কামে লাগা আজ থেকে। একদম নয়া চিড়িয়া আছে। কুছদিন পিছে পিস্টন লাগিয়ে আচ্ছা করে কড়কে দিস। তাহলে একদম লাইনের হয়ে যাবে।

বলে সিংবাবু ভাল চোখটা টিপে আবার খুক খুক করে একটু হাসল।

আবদুল বলল, একদম পালিস করে দেব সিংজী। দুদিনে ঠিক লাইনে লিয়ে আসব।

তারপর কোটালের দিকে চেয়ে বলল, চল ওস্তাদ।

চারদিকে দুমদাম খুটখাট হাতুড়ী পেটার আওয়াজ হচ্ছে। জনা-বিশেক লোক বিভিন্ন গাড়ির নিচে শুয়ে কাজ করছে। আবদুল তাকে গ্যারেজে নিয়ে গিয়ে হাতে একটা কাপড় ধরিয়ে দিল। তারপর দূরের একটা কালো গাড়ি দেখিয়ে বলল, যা সাবান জল দিয়ে গাড়িটা পরিষ্কার করতে লেগে পড়।

কোটাল ঘাড় নেড়ে গাড়ির দিকে এগোচ্ছিল। হঠাৎ পেছন থেকে আবদুল ডাকল, এই শোন।

কোটাল ফিরে দাঁড়াল।

আবদুল কিছুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে থাকল। তারপর ফিস ফিস করে বলল, একটু সাবধানে চল ওস্তাদ। এ বড় ভয়ংকর জায়গা।

রাত্রে দুটো রুটির সঙ্গে ডাল আর একটু শাক খেতে পেল কোটাল। গ্যারেজে ওর মত আরও তিনটে ছেলে আছে। ওদের নাম সেলিম কেষ্ট আর বাচ্চাবাবা। ওর নাম বাচ্চাবাবা কেন কোটাল বুঝল না। সবাই ওকে বাচ্চা বলে ডাকছিল। যারা কাজ করছিল গাড়ির নিচে শুয়ে তাদের ও চা, সিগারেট এনে এনে দিচ্ছিল। ওই তিনজনের সঙ্গে আলাপ হল কোটালের। রাতে খাওয়ার পর গ্যারেজের পেছনে শুতে পেল ও। সঙ্গে সেলিম, কেষ্ট আর বাচ্চাবাবা। ওদের চটের বিছানা আছে। কোটালের নেই। কোটাল খালি মাটির ওপরই শুল। খুব ঘুম পাচ্ছিল ওর। সারাদিনে দশটা গাড়ী পরিষ্কার করেছে ও। শুয়ে পড়তেই ঘুম পাচ্ছিল ওর। অফিস ঘরে কিছুক্ষণ ধরে সিংজীর চ্যাঁচামেচি শুনতে পাচ্ছিল। গ্যারেজের সবাই লোকটাকে সিংজী বলে।

হঠাৎ দেখল, বাচ্চাবাবা সেলিম আর কেষ্টর সঙ্গে কী ফিসফিস করছে। কি কথা ওরা বলছিল কোটাল শুনতে পারছিল না। হঠাৎ বাচ্চাবাবা ওর কাছে এসে বলল, তুই আমার পয়সা চুরি করেছিস কেন।

কোটাল অবাক। আমি তোমার পয়সা চুরি করলাম কখন !

—জরুর করেছিস। এরা সব দেখেছে। বাচ্চা সেলিম আর কেষ্টকে দেখাল।

—কিরে এ চুরি করেছে কিনা।

সেলিম আর কেষ্ট মাথা নাড়ল, হ্যাঁ ওরা দেখেছে চুরি করতে।

কোটাল বলল, না, আমি কখনোই চুরি করিনি। আমি চুরি করি না।

বাচ্চাবাবা দাঁত খিঁচিয়ে বলল, ও আমার যুধিষ্ঠিরের পহলা ছেলে অভিমুন্যু রে। আমি চুরি করি না। তুই চুরি করেছিস। বের কর আমার পয়সা।

এরা কেন ওকে মিথ্যা মিথ্যা দুষছে কোটাল বুঝতে পারছিল না। ওর খুব ঘুম পাচ্ছিল। বলল, আমি চুরি করিনি। বিশ্বাস কর।

হঠাৎ বাচ্চাবাবা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পড়ে কিল চড় ঘুষি চালাতে লাগল। চুরি করেছিস কি করিসনি চল সিংজীর কাছে বিচার হবে।

সেলিম, কেষ্ট আর বাচ্চাবাবা ওকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল সিংজীর কাছে। ওদের তিনজনের মুখে সিংজী শুনল কোটাল বাচ্চাবাবার পয়সা চুরি করেছে। শোনামাত্র সিংজী কোটালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কোটালকে পিটতে লাগল।

কোটাল বলছিল, আমি চুরি করিনি সিংজী। বিশ্বাস করুন, আমি চুরি করিনি।

কোটাল মেঝেতে গড়াগড়ি যাচ্ছিল। দরজার বাইরে সেলিম, কেষ্ট আর বাচ্চাবাবা দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে দেখছিল, কোটালের মার খাওয়া। কতক্ষণ মার চলত কে জানে, কিছুক্ষণ পর আবদুল এসে কোটালকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেল।

পরে জেনেছ কোটাল, সিংজী রোজ রাত্রে মদ খেয়ে এসে পালা করে একজনকে ধরে পেটায়। না পেটালে সিংজীর ঘুম আসে না। কিছুক্ষণ পেটানোর পর আবদুল এসে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। আবদুল গ্যারেজের হেড মেকানিক।

সেদিন বাচ্চাবাবার পালা ছিল। বাচ্চা বুদ্ধি করে পালাটা কোটালের ঘাড়ে চালান করে দিয়েছিল।

পাঁচ

কোটাল টলতে টলতে এসে গ্যারেজের পেছনে এসে শুয়ে পড়ল।

বাচ্চাবাবা একবাটি জল আর ন্যাকড়া নিয়ে কোটালের মাথার কাছে বসল। যেখানে যেখানে কালসিটে পড়েছিল সেখানে জলের পটি লাগিয়ে দিতে লাগল। সেলিম একটা তালপাতার পাখা নিয়ে কোটালকে হাওয়া করছিল।

বাচ্চাবাবা বলল, তুই আগে যেখানে কাজ করতিস সেখানে মালিক তোকে মারত না।

কেষ্ট এক কোণে বসে অনেকক্ষণ ধরে একটা পোড়া বিড়ি ধরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল। সে উত্তর করল, আবদুলভাই বলল ও একদম নতুন, আগে কোথাও কাজ করেনি।

সেলিম অভিজ্ঞ গলায় বলল, তাই এত হেদিয়ে পড়েছে। আমরা শালা এত মার খাচ্ছি তবু কিছু হয় না।

কেষ্ট বলল, হয়ে যাবে, হয়ে যাবে। সব সহ্য হয়ে যাবে।

কোটাল গোঙাচ্ছিল। বাচ্চাবাবা ওর মুখের ওপর ঝুঁকে বলল, খুব কষ্ট হচ্ছে, কোটাল।

কোটাল মাথা নাড়ল।

—কোথায় কষ্ট হচ্ছে।

ঠিক কোথায় কষ্ট হচ্ছে কোটাল দেখাতে পারল না। সমস্ত শরীরে অসহ্য ব্যথা। বাচ্চাবাবা কপালের পটি পালটে দিল। সেলিমকে ধমক দিল, একটু জোরে হাওয়া কর না। খাসনি নাকি আজ।

সেলিম জোরে জোরে হাওয়া করতে লাগল।

কেষ্ট বিড়ি ফেলে দিয়ে ওপাশ থেকে উঠে এল। সেলিমকে বলল, যা, তুই ওঠ। এবার আমি হাওয়া করছি।

সেলিম উঠে গিয়ে কেষ্টর ফেলে দেওয়া বিড়িটা কয়েকবার টানার চেষ্টা করল।

কেষ্ট কোটালের মাথার কাছে বসে বন বন করে হাওয়া করতে লাগল। কোটালের খুব অবাক লাগছিল। এই কিছুক্ষণ আগে যারা তাকে ওমনভাবে মিথ্যে মার খাওয়াল তারাই আবার তাকে এমন শুশ্রূষা করছে! কোটালের একটু লজ্জাও করছিল। মাথায় জলপটি পড়তে কিছুটা সুস্থও লাগছিল। বলল, ব্যাস, আর কিছু করতে হবে না। আমি ভাল হয়ে গেছি।

বাচ্চা বলল, সাবাস দোস্ত। এই না হলে ওস্তাদ।

কোটাল উত্তরে হাসল।

বাচ্চা বলল, আজ আমার মার খাওয়ার পালা ছিল বুঝলে, দোস্ত। আমি ভাবলাম তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিই। কিন্তু সিংজী প্রথমদিনই তোমাকে এমন বেধড়ক মারবে ভাবতে পারিনি।

কোটাল বলল, ঠিক আছে, আমার এখন তার কষ্ট হচ্ছে না।

বাচ্চা জামার ভেতর থেকে একটা রুটি আর একদলা গুড় বের করল। কোটালকে বাড়িয়ে দিল সেটা, নে খা।

গ্যারেজে ছেলেদের মধ্যে একটা অলিখিত নিয়ম আছে। কেউ কারো সঙ্গে ভাব করতে চাইলে তাকে নিজের ভাগ থেকে একটা রুটি দেবে। বাচ্চা অবশ্য রুটিটা খাওয়ার সময় চুরি করে রেখেছিল

কোটাল রুটি দেখে অবাক হল, কী হবে!

—খা।

—আমার ত খিদে নেই।

—খিদে নেই বলিস কিরে! ওই দুটো রুটি খেয়ে তোর পেট ভরে গেল! আমাদের পেটে ত সবসময় আগুন জ্বলে।

রুটি দেখে সেলিমের চোখ চক চক করে উঠল। বলল, তুই আজও রুটি ঝেড়েছিস।

বাচ্চা বলল, তুইও ত আজ দুটো ঝেড়েছিস খাওয়ার সময়। আমি দেখেছি।

কেষ্ট বলল, আমি আজ একটাও ঝাড়তে পারিনি। আমি খাওয়ার সময় সিংজী রান্নাঘরে এসেছিল। রুটিটা আজ আমাকে দে, আমি কাল শোধ দিয়ে দেব।

বাচ্চা বলল, তোর কাছে এর আগের পাঁচটা রুটি পাই।

সেলিম বলল, আমার তিনটে। কবে শোধ দিবি।

কেষ্ট করুণ গলায় বলল, কি করব বল। আমি তোদের মত এখনও ঝাড়ার কায়দা ভাল মত শিখতে পারিনি। এর আগে যে মিষ্টির দোকানে ছিলাম সেখানে, খাওয়ার অভাব ছিল না, মাইরী। ভাবছি আবার সেখানেই চলে যাব কিনা।

কোটাল অবাক হয়ে এদের কথা শুনছিল।

সেলিম বলল, সেখানকার মালিক ত মেরে তোর ঠ্যাঙ ভেঙে দিয়েছিল। সেখানে আবার যাবি।

—সেই জন্যই ত ভাবি। তা না হলে কি এতদিন এখানে পড়ে থাকতাম। কিন্তু খিদেও আর সহ্য হয় না।

বাচ্চা বলল, কিন্তু রুটিটা ত এখন কোটালের। কোটাল যদি তোকে দেয় আমার আপত্তি নেই।

কেষ্ট করুণ চোখে কোটালের দিকে চাইল।

কোটাল বলল, বেশ রুটিটা যদি আমার হয় তবে ওটা আমি কেষ্টকে দিলাম।

কেষ্ট কৃতজ্ঞতায় গলে পড়ল। বাচ্চা রুটিটা কেষ্টকে দিল।

কিছুক্ষণ পর ওরা সার সার পাশাপাশি শুয়ে পড়ল। সেলিমের বিছানায় ভাগাভাগি করে শুল কোটাল। ওরা বলল, কদিনের মধ্যেই কোটালকে ওরা একটা চট ম্যানেজ করে দেবে।

বাচ্চা শুয়ে শুয়ে ওর সংসার গল্প বলছিল। বলতে বলতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বেচারা নিজেই জানে না। বাচ্চার বয়স দশ। কেষ্টর সাত। সেলিমের আট।

বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়ার পর কেষ্ট জামার ভেতর থেকে আরো দুটো লুকনো রুটি বের করে খেতে শুরু করল। শুধুই রুটি, গুড় নেই।

দেখে কোটাল অবাক।

সেলিম চোখ টিপে ফিস ফিস করে বলল, ও কিছু না। কেষ্টর কিছুতেই খিদে মেটে না। আগে মিষ্টির দোকানে ছিল কিনা। দরবেশ, রাজভোগ খেয়ে খেয়ে পেটের খোল বেড়ে গেছে। এখন আর কিছুতেই খিদে মেটে না। রোজ চার পাঁচটা রুটি ঝেড়ে খায়। অথচ, আমাদের কাছে রুটি দেখলেই বলে, ও আজ একটাও রুটি চুরি করতে পারেনি। রুটির ব্যাপারে কেষ্টর মিথ্যে কথা বলাটা আমরা মেনে নিয়েছি।

সেলিমের কথা শুনতে শুনতে কোটালের গভীর ঘুম পাচ্ছিল। আস্তে আস্তে ও চোখ বন্ধ করল। পাশে শুয়ে সেলিম সমানে বকবক

করছে। কেষ্ট ওপাশে বসে জলে ভিজিয়ে রুটি চিবুচ্ছে আর কোটালের দিকে চেয়ে চেয়ে মাঝে মাঝে সরলভাবে হাসছে।

গ্যারেজে এখন কোন শব্দ নেই। চারদিক নিস্তব্ধ। চুপচাপ। সকাল থেকে এই প্রথম কোটালের জায়গাটা ভাল লাগল।

ছয়

কোটাল এখনও রুটি চুরি করতে শেখেনি, কিন্তু আর সব ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সকালে আটটা-দশটা গাড়ী ধোয়া-মোছা পরিষ্কার করা, চা সিগারেট আনতে যাওয়া, সন্ধেবেলা পালাক্রমে সিংজীর হাতে মার খাওয়া, রাত্রে আবদুল ভাইয়ের গা-হাত-পা টেপা— এসব এখন খুব ভাল মত করতে পারছে কোটাল। রাত্রে এখন আর দুটো রুটিতে পেট ভরছে না ওর। ওর হয়ে বাচ্চাবাবা রুটি চুরি করে এনে দেয় ওকে।

একদিন ও বাচ্চাবাবাদের সঙ্গে রাত্রে পালিয়ে নাইট শোয়ে হিন্দি সিনেমা দেখে এল পর্যন্ত। বুঝল না অবশ্য কিছু। সেলিম, বাচ্চা ওরা খুব সিটি মারছিল ছবি দেখতে দেখতে। হল থেকে বেরিয়ে এসে কোটাল কয়েকবার মুখে আঙুল পুরে সিটি মারতে চেষ্টা করেছিল। হয়নি। কেষ্ট ভারিক্কি চালে বলেছে, পরে ওকে শিখিয়ে দেবে। তবে গুরুদক্ষিণা হিসাবে দুটো রুটি দিতে হবে। কোটাল স্বীকার হয়েছে, দেবে।

এর মধ্যে আবার একদিন একটা ব্যাপার ঘটল। কেষ্ট একদিন রাত্রে পালাল। ওরা অবশ্য জানত। ব্যারাকপুরে একটা হোটেলে ও চাকরি ঠিক করেছে। খাওয়া-থাকা ছাড়াও মাসে বিশ টাকা মাইনে। যাওয়ার আগে ও কোটালকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিল। বলেছিল, হোটেলের মালিককে বলে কয়ে ও কোটালের জন্যেও একটা ব্যবস্থা করতে পারবে হয়ত। কিন্তু কোটাল রাজী হয়নি। ভয় পেয়েছে। বাচ্চাবাবাও মানা করেছে। কেষ্টকেও মানা করেছে। বলেছে, সিংজী

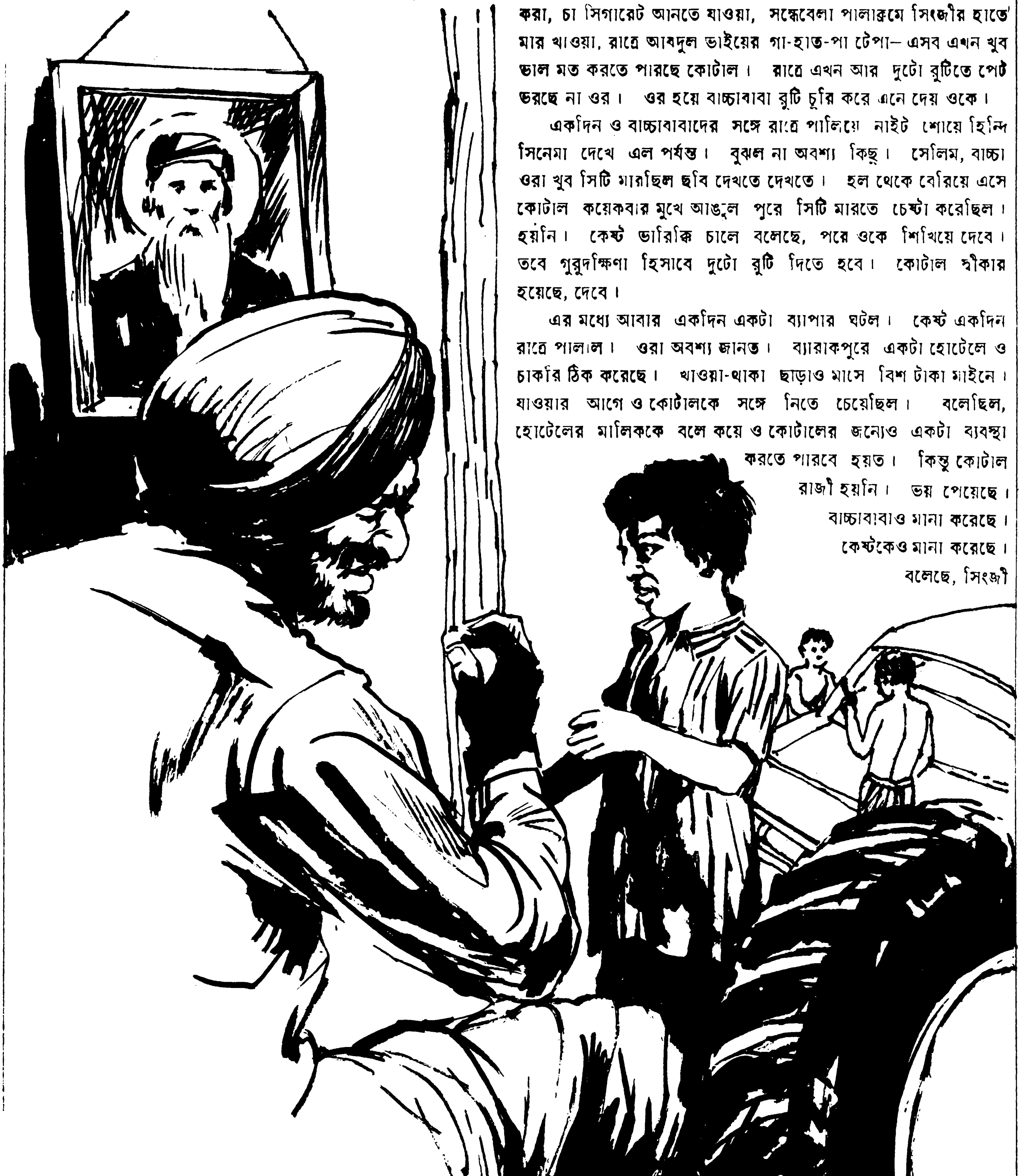

ভাগার মতলব করিস তবে মেরে খাল খিঁচে লিব, বুঝেছিস

ভয়ঙ্কর লোক। সিংজীর খপ্পরে একবার যে পড়েছে তার ছাড় নেই। বাইরে তাদের মত ছোকরাদের থাওয়া-থাকা ছাড়াও বিশ-তিরিশ টাকা মাইনে হয়। কিন্তু সিংজী বিনি মাগনা লোক রাখে। জোর করে রাখে। যদি কেউ পালিয়ে যায় সিংজী ঠিক তাকে আবার খুঁজে বের করে নিয়ে আসে। সিংজীর এখানে একবার এসে পড়লে সে সিংজীর সম্পত্তি হয়ে যায়। আসলে সিংজী বাচ্চাদের কিনে নেয়। কেষ্টর মাও কেষ্টকে দেড়শ টাকায় সিংজীর কাছে বিক্রি করে দিয়ে গেছে। বাচ্চা-বাবা এইসব ঘাতঘোঁত সব জানে। সে নিজেও পালিয়েছিল। সিংজী ঠিক খুঁজে বের করে নিয়ে এসেছে। বাচ্চার বাবা বাচ্চাকে আশি টাকায় বিক্রি করে গেছে ছ' বছর আগে।

কিন্তু কেষ্ট মানা শুনল না। বলল, এখানে ওর কিছুতেই খেয়ে পেট ভরছে না। ও এখানে থাকলে না খেতে পেয়ে মরে যাবে।

রাত বারোটায় গ্যারেজের প্রাচীর টপকে কেষ্ট পালাল। বাচ্চাবাবা ওকে কাঁধে তুলে দিল। সেলিম পেছন থেকে ঠেলে দিল।

পরদিন সকালে সিংজী পাগলের মত লাফালাফি জুড়ে দিল।

কোটাল, বাচ্চা আর সেলিমকে ডেকে পাঠিয়ে চড়চাপড় দিয়ে জেরা করল, কেষ্ট কোথায় গেছে ওরা জানে কিনা।

ওর তিনজনে চোখ ছুঁয়ে দিব্যি করল, কেষ্ট কোথায় গেছে, কখন গেছে কিছু জানে না ওরা।

কোটাল জীবনে এই প্রথম মিথ্যা কথা বলল। বলে বেশ আনন্দ পেল। ওর মা বলত, বাবা জীবনে কখনো মিথ্যে কথা বলো না। মিথ্যে বললে পাপ হয়। কিন্তু কোটাল আজ আবিষ্কার করল, কখনো কখনো সত্যিকথা বললেই পাপ হয়। মিথ্যে বললে, পুণ্য হয়।

সিংজী বিশ্বাস করল না। আরো মারধোরের তোড়জোড় করছিল। আবদুলভাই এসে বাঁচিয়ে দিল। সে এসে বলল, হ্যাঁ এরা সত্যিই কিছু জানে না। কারণ, কাল সে ওদের তিনজনকে আলাদা শুতে দেখেছে।

ঠিক দুদিন পর ব্যারাকপুরের হোটেল থেকে কেষ্টকে ধরে আনল সিংজী। গ্যারেজে এনে প্রচণ্ড পিটল। প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় আবদুলভাই ওকে কোলে করে গ্যারেজের পেছনে ওর শোবার জায়গায় দিয়ে গেল।

তিনদিন ধরে কোটাল, বাচ্চা, সেলিম ওর খুব সেবা যত্ন করল। মাঝে মাঝে আবদুলভাই এসে খোঁজ নিত। চারদিনের দিন কেষ্ট উঠে বসল। পঞ্চমদিন থেকে কেষ্ট খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল।

কেষ্টর ঘটনার পর প্রায় মাসতিনেক কেটে গেছে। আর একদিন আর একটা ঘটনা ঘটল। ব্যাপারটা অবশ্য এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু কোটাল ঘটনাটা ভুলতে পারে না।

সেদিন সকালে গ্যারেজের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কোটাল যথারীতি একখানা ফিয়াট মুছছিল। সকাল বোধহয় তখন নটা দশটা হবে। এমন সময় গ্যারেজের গেটের সামনে একখানা হলুদ স্ট্যাণ্ডার্ড গাড়ী এসে দাঁড়াল। গাড়ী থেকে ছাব্বিশ সাতাশ বছরের একটি মেয়ে নেমে এল। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মুহূর্তের জন্য কোটালের সমস্ত শরীর স্থির হয়ে গেল। কোটালের মনে হল, পৃথিবীতে এত সুন্দর মানুষও নয়! গপ্পের বইতে ও পরীদের এমন সুন্দর চেহারা দেখেছে। কোটালের মনে হল, মেয়েটি এই মাত্র স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে।

কোটাল অবাক বিস্ময়ে মেয়েটির দিকে চেয়েছিল। কোটালের বড় বড় চোখে একটাও পলক পড়ছিল না।

মেয়েটি গাড়ী থেকে নেমে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে হঠাৎ কোটালের দিকে চোখ পড়ল।

কোটালের একহাতে কাপড়, একহাতে সাবান, পায়ের কাছে ময়লা জলের বালতী, হাঁ করে মেয়েটির দিকে চেয়ে আছে। কোটালের ওরকম অবস্থা দেখেই কিনা কে জানে, মেয়েটি ওর দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল। তারপর হাতছানি দিয়ে কোটালকে কাছে ডাকল।

কোটাল আড়ষ্ট পায়ে কাছে গেল। মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, এটি সিংজীর গ্যারেজ?

কোটাল নিঃশব্দে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

—সিংজী আছেন?

কোটাল আবার নিঃশব্দে মাথা দোলাল। আছেন।

—আমাকে একটু তার কাছে নিয়ে যাবে?

কোটাল আবার ঘাড় নেড়ে জানাল, আসুন। কোটাল গ্যারেজের ভেতরে অফিসঘরে নিয়ে এল তাঁকে। আঙুল তুলে বলল, ওই অফিসে যান। ওখানে সিংজী আছেন।

মেয়েটি ধীর পায়ে অফিসে উঠে গেল।

কোটাল আবার নিজের গাড়ীর কাজে ফিরে এল। কিছুক্ষণ পর মেয়েটির সঙ্গে সিংজী আর আবদুলভাই অফিসঘর থেকে বেরিয়ে এল। আবদুলভাই একটানে গাড়ীর বনেট খুলে ফেলল। তারপর তিনজনের মধ্যে কি আলোচনা হল। কোটাল দেখল সিংজী মেয়েটিকে খুব খাতির করছে। খুব সমীহ করে কথা বলছে। আর মেয়েটির মধ্যে কেমন একটা রাণী রাণী ভাব আছে।

কিছুক্ষণ পর সিংজীর গ্যারেজের একখানা অ্যাম্বাসাডার গাড়ী করে মেয়েটি ফিরে গেল। স্ট্যাণ্ডার্ড গাড়ীখানা আবদুলভাই চালিয়ে গ্যারেজের ভেতরে নিয়ে গেল।

অ্যাম্বাসাডার গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে গেটের কাছে আবার কোটালের উপর চোখ পড়ল তাঁর। আর পড়তেই গাড়ী থামিয়ে কোটালকে কাছে ডাকল।

কাছে যেতে মেয়েটি হেসে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি?

—কোটাল।

—কোটাল! বাঃ, কী সুন্দর নাম তোমার!

মেয়েটি বিস্মিত গলায় বলল।

উত্তরে কোটাল লাজুক মুখে হাসল।

—তুমি বুঝি গাড়ী সারাও!

কোটাল মাথা নাড়ল, না, গাড়ী মুছি।

মেয়েটি চোখ বড় বড় করে বলল, বাঃ, গাড়ী মোছা বুঝি সহজ কাজ। গাড়ী সারানোর চেয়ে গাড়ী মোছা মোটেও সহজ কাজ নয়। আমার গাড়ী মুছতে খুব ভাল লাগে।

কোটাল চুপ করে রইল।

—আমি একদিন তোমার কাছে এসে তোমার কাজ শিখে নেব। তুমি শেখাবে তো আমাকে?

কোটাল গম্ভীর গলায় বলল, মেয়েরা তো গাড়ি মোছে না।

মেয়েটি হেসে ফেলল, গাড়ি বুঝি শুধু ছেলেরাই মোছে? আচ্ছা সে দেখা যাবে। আমি আবার আসব একদিন।

গাড়ি স্টার্ট করে মেয়েটি চলে গেল। কোটালের মনে হল, মা মারা যাবার পর এই প্রথম কেউ একজন তার সঙ্গে এতক্ষণ ভালভাবে কথা বলল।

তারপর মেয়েটি আর একদিন এসেছিল। সাতদিন পর। তার স্টাণ্ডার্ড গাড়িখানা নিতে। ততদিনে গাড়িখানা সারান হয়ে গেছিল। কোটাল দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিল। কোটাল বুঝতে পারছিল, আজ ও খুব ব্যস্ত আছে। শুধু গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে কোটালকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, ভাল আছ?

কোটাল মাথা নেড়ে জানাল, ভাল আছে।

তারপর ব্যাগ খুলে একটা চকলেট-বার বের করে কোটালের হাতে দিল, এই নাও, এটা তোমার জন্য এনেছি।

তারপর গাড়ি চালিয়ে চলে গেল।

রাত্রে শোয়ার সময় বড় চকলেটটা ভাগ করে ওরা খেল। জীবনে এমন চকলেট ওরা কেউ খায়নি।

মেয়েটি এরপর আর কোনদিন ফিরে আসেনি।

সাত

এরপর কটা মাস শান্তিতেই কাটল। কোটালরা নাইট-শোয়ে আরো কটা হিন্দি সিনেমা দেখে এসেছে। কোটাল এখন সিটি মারতে শিখেছে। কেস্ট যত্ন করে শিখিয়েছে। বুটি চুরি করাটা এখনো ঠিক রপ্ত করে না উঠতে পারলেও তাস খেলাটা শিখে নিয়েছে।

কিন্তু এর মাস কয়েক পর কোটালের একদিন মন বিগড়াল। কোটাল পালাবে ঠিক করল। ব্যাপারটা ঘটল এইভাবে।

গ্যারেজে অনেক গাড়ি জমে গেছিল। তাই নতুন যে গাড়িগুলি সারানোর জন্য আসতে লাগল সেগুলি বাইরে রাস্তার দুপাশে ফুটপাত ঘে'সে সার সার করে রাখা হত। কোটাল এতদিন গ্যারেজের ভেতরেই কাজ করেছে। চা সিগারেট আনতে কখনো বাইরে এসেছে। তাছাড়া দিনের বেলায় কখনো প্রায় বাইরে আসেনি। তাই গ্যারেজের বাইরের দুনিয়াটা সম্বন্ধে এক রকম উদাসীনই ছিল ও।

কিন্তু সেবার গাড়িগুলি বাইরে এসে জমতে ওকে গ্যারেজের বাইরে যেতে হল গাড়ি মুছতে। এইরকমই একদিন গাড়ি মুছছিল কোটাল, হঠাৎ গাড়ির ওপর থেকে রাস্তায় চোখ পড়তে ওর চোখ আটকে গেল। দেখল, একদল ছেলে গল্প করতে করতে স্কুলে যাচ্ছে। পরনে নীল হাফপ্যান্ট, গায়ে ঝকঝকে সাদা হাফসার্ট, গলায় খয়েরী রঙের নেকটাই বাঁধা। বুকের বাঁদিকে স্কুলের ব্যাজ। হাতে এলোমিনিয়মের সুটকেশ। সবাই প্রায় ওর বয়সী।

হঠাৎ কোটালের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। ওরও তো স্কুলে পড়ার কথা ছিল। মা বলত, কোটাল, তুই লেখাপড়া শিখে বড় হবি। তখন আর আমাদের কোন দুঃখ থাকবে না।

কোটাল তো খুব মন দিয়ে লেখাপড়াই করত। ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছিল। তবে এমন হল কেন? মায়ের কথা মনে পড়তে এই প্রথম কোটালের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল কোটাল কিছুই বুঝতে পারে না। আর মামাও বা তাকে এমন একটা জায়গায় দিয়ে গেল কেন, যেখানে লেখাপড়া শেখা যায় না! কোটাল বুঝতে পারে না। কোটালের মনে হল, লেখাপড়া না শিখলে ওর মা খুব কষ্ট পাবে। ওর মা তো স্বর্গে বসে কোটালকে সব সময় দেখতে পাচ্ছে। শুধু সে-ই মাকে দেখতে পাচ্ছে না।

কোটালের আর কাজ করতে ভাল লাগছিল না। জানে, সিংজীর চোখে পড়লে পিঠের চামড়া তুলে নেবে। তবু কোটাল গাড়িতে হেলান দিয়ে ফুটপাতে বসে পড়ল। সামনের পার্কে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলছিল। ওদের চিৎকার চেঁচামেচীর আওয়াজ আসছে। সব ছাপিয়ে আসছে গ্যারেজের হাতুড়ী পেটার শব্দ।

গাড়িতে হেলান দিয়ে ফুটপাতে বসে সতেরো ঘরের নামতাটা আওড়াতে গিয়ে কোটাল অবাক হয়ে গেল। ওর এখনো সব মনে আছে!

রাত্রে গ্যারেজের পেছনে শুয়ে ও বন্ধুদের কাছে কথাটা পাড়ল।

—আমি স্কুলে পড়ব।

ওরা প্রথমটা থ। কোটাল যেন পৃথিবীর বাইরের কোন গ্রহের প্রাণী—এইভাবে ওর দিকে চেয়ে রইল।

বাচ্চাই প্রথম কথা বলল. ইস্কুলে!

যেন কথাটা বাচ্চা ঠিক শুনতে পায়নি।

কোটাল মাথা নাড়ল। হ্যাঁ স্কুলে।

—কি করে পড়বি?

কোটাল বলল, আমি মামার কাছে চলে যাব। তারপর মামার হাতে পায়ে ধরে খুব করে বলব। তাহলে মামা নিশ্চয়ই আমাকে স্কুলে ভর্তি

রাস্তায় চোখ পড়তে ওর চোখ আটকে গেল

করে দেখে।

সেলিম এবার শব্দ করে হাসল। তোর মামা তোকে দেবে স্কুলে। তাহলে প্রথমেই দিত। এই গ্যারেজে এনে ভর্তি করে দিত না।

কোটাল গোঁয়ারের মত বলল, কিন্তু আমাকে যেকরে হোক স্কুলে ভর্তি হতেই হবে।

বাচ্চা বলল, সে তো বুঝলাম। কিন্তু হবি কি করে?

—কেন মামা……

সেলিম ধমক দিল, আবার মামা।

কেষ্ট এতক্ষণে কথা বলল, কোটাল তোর মামী লোক কেমন?

—ভাল।

—তাহলে তুই তোর মামীর হাতে পায়ে ধর। তাহলে নিশ্চয়ই একটা ইস্কুলে ভর্তি হতে পারবি।

কথাটা সবার মনে ধরল। কোটাল ওর মামার বাড়ির ঠিকানা জানে। কিন্তু কলকাতার রাস্তা চেনে না। পরামর্শ করে ঠিক হল, কেষ্ট ওকে মামাবাড়ি অবধি পৌঁছে দেবে। দুদিন পরের একটা দিন ঠিক করা হল। ঠিক হল সেদিন কোটাল পালাবে। কেষ্ট ওকে মামার বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে আবার রাত্রেই ফিরে আসবে।

পালানোর দিন সকালবেলায় যথারীতি কাজকর্ম করল ওরা। কোটাল জলের বালতী, সাবান আর ন্যাকড়া নিয়ে গাড়ি মুছতে লাগল। কেষ্ট গাড়ির নিচে মিস্ত্রিদের হাতে হাতে প্লাস, স্পানার এগিয়ে দিতে লাগল। সেলিম টায়ারের পাম্পার সারাতে বসল। আর বাচ্চাবাবা যথারীতি চা সিগারেট এনে দিতে লাগল।

কিন্তু বেলা যত বাড়তে লাগল কোটালের মন তত দমে যেতে লাগল। শেষে বিকেলের দিকে কোটাল মনস্থির করে ফেলল, ও যাবে না। ব্যাপারটা বড় স্বার্থপরের মত হয়ে যাচ্ছে। সেলিম, কেষ্ট, বাচ্চাবাবাকে ছেড়ে ও একা স্কুলে পড়তে যেতে পারে না। ওরা মোটরের মিস্ত্রি হবে আর ও নিজে লেখাপড়া শিখে বড় হবে এটা হতে পারে না। ছিঃ ছিঃ ওরা ওর সম্বন্ধে কী ভাবছে কে জানে।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর কেষ্ট যখন পালাবার তোড়জোড় করছে তখন কোটাল কথাটা ভাঙল, আমি যাব না।

সেলিম অবাক, যাবি না!

—না।

—তবে কি করবি।

—এখানে থাকব।

কিন্তু বাচ্চাবাবা কোটালের আপত্তি হেসে উড়িয়ে দিল। বলল, একবার যখন যাওয়া ঠিক হয়েছে তখন কোটালকে যেতেই হবে।

বলল, দেখ কোটাল, আমাদের জন্য মন খারাপ করিস না। তুই যদি বড় হওয়ার সুযোগ পাস তবে আমাদেরও আনন্দ হবে। তোর যখন সুযোগ আছে তখন একবার চেষ্টা করে দেখ। আমাদের তো কেউ নেই। আমাদের কে স্কুলে পড়াবে বল।

সেলিম আর কেষ্টও বোঝাল ওর যাওয়াই উচিৎ। এই নরকে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না। শেষ অবধি কোটাল অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হল।

ঘণ্টাখানেক পরে বাচ্চাবাবা এসে জানাল সব রেডী। এবার বেরুনো যেতে পারে। সিংজীর ঘরের আলো নিভে গেছে। গ্যারেজের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

সেলিম বিছানার নিচ থেকে ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী প্রিয় গুলতিটা বের করল।—এটা নে কোটাল।

কোটাল অবাক। গুলতিটা সেলিম কত ভালবাসে কোটাল জানে। বলল, এটা দিয়ে আমি কি করব।

—তুই রাখ না। পরে আমি একটা বানিয়ে নেব।

বাচ্চাবাবা পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে কোটালের হাতে গুঁজে দিল।—আমি এটা তোকে দেব বলে রেখে দিয়েছি।

কোটাল অভিভূত।—এটা দিয়ে কি করব।

বাচ্চাবাবা লাজুক হেসে বলল, রাখ। যখন স্কুলে ভর্তি হবি, তখন ওটা দিয়ে একটা বই কিনিস আর তাতে আমার নাম লিখিস। চুরির পয়সায় একটা ভাল কাজ হোক।

চা আর সিগারেট আনার পয়সা চুরি করে করে বাচ্চা এই পয়সা জমায়—কোটাল জানে। এই পয়সা দিয়ে ওরা নাইট শোয়ে সিনেমা দেখে।

বাচ্চার চোখ চকচক করছিল, চাপা গলায় বলল, আমার খুব প্লেনের পাইলট হতে ইচ্ছে করত। ছোটবেলায়। কিন্তু স্কুলে না পড়লে কি কেউ পাইলট হতে পারে।

কোটাল মাথা নিচু করল। টাকাটা মুড়ে পকেটে রেখে দিল।

কেষ্ট পেছন থেকে তাড়া দিল।—চল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যাক।

বাচ্চাও বলল, হ্যাঁ, এবার বেরিয়ে পড়। কেষ্ট তুই কিন্তু রাতের মধ্যেই যে করে হোক ফিরে আসবি। তা না হলে জানাজানি হয়ে যাবে।

বাচ্চার কাঁধে চড়ে ওরা প্রাচীর ডিঙাল। পেছন থেকে ঠেলে দিল সেলিম।

রাস্তায় নেমে দুই বন্ধু হাঁটতে লাগল। কোটালের মামার বাড়ী শ্যামবাজারের কাছে। গ্যারেজটা পার্ক সার্কাসে। অনেকখানি পথ। একটু তাড়াতাড়ি পা চালাল ওরা। ঘণ্টাদুয়েক পর ওরা পৌঁছে গেল। শ্যামবাজারের কাছে একটা বড় বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে কোটাল বলল, এই বাড়ী।

কেষ্ট বাড়ীটা ভাল করে দেখল, তারপর বলল, ঠিক এই বাড়ী ত, দেখ ভাল করে।

—হ্যাঁ, এই বাড়ী। আমি চিনতে পারছি।

বিরাট বাড়ী। গেট বন্ধ। ভেতরে দারোয়ান ঘুমোচ্ছে। কেষ্ট বলল, তুই রাতটুকু গেটের পাশে ফুটপাতে শুয়ে কাটিয়ে দে। সকালে গেট খুললে ভেতরে ঢুকিস।

কোটাল পাশের ফুটপাতে চেয়ে দেখল, আরো অনেকে শুয়ে আছে। ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, ভিখিরি।

—দেখ থাকতে পারবি ত। নাকি আমি সকাল অবধি সঙ্গে থাকব।

—না, না, আমি একা থাকতে পারব। যদিও কোটালের মন বেশ দমে গেছিল।

কেষ্ট বলল, তা হলে আমি চলি, কি বল। সকালের মধ্যে আবার পৌঁছতে হবে।

কোটাল বলল, হ্যাঁ. হ্যাঁ তুই যা। সকালের মধ্যে পৌঁছতে না পারলে আবার ধরা পড়ে যাবি।

কিন্তু কেষ্ট গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কেমন লাজুক গলায় ডাকল, কোটাল—

কোটাল অবাক হয়ে চোখ তুলল।

কেষ্ট বলল, তোকে আমি একটা জিনিস দেব। ওদের সামনে দিতে পারিনি, লজ্জা করছিল।

কেষ্ট জামার ভেতর থেকে দুটো রুটি বের করল।—সকালে খাস।

কেষ্ট দিচ্ছে রুটি! এটা যে পৃথিবী ভেঙে পড়লেও সেলিম আর বাচ্চা বিশ্বাস করবে না। কোটালের চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করল, দেখ, দেখ, দেখে যা সেলিম, বাচ্চা, কেন আমি গ্যারেজ ছেড়ে আসতে চাইনি। তোরা আমাকে কেন দূরে সরিয়ে দিলি।

কোটাল আর পারল না! কেষ্টকে জড়িয়ে ধরে হু হু করে কেঁদে ফেলল।

কেষ্ট অপ্রস্তুত। কোটালের পিঠে ঠোকা দিয়ে বলল, কাঁদিস না কোটাল। ভয় কি। আমি মাঝে মাঝে এসে তোকে দেখে যাব, কেমন।

কোটালের গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরুচ্ছিল না।

কেষ্ট ভাঙা গলায় বলল, কোটাল এবার যাইরে। নয়ত সকাল হয়ে যাবে।

কেষ্ট পেছন ফিরে হাঁটা দিল।

রাতের অন্ধকারের মধ্যে ডুবে ট্রাম লাইনগুলো চকচক করছে। ট্রাম লাইন ধরে কেষ্ট হাঁটছে, ওই ত। কোটালের ইচ্ছে হল, দৌড়ে গিয়ে ওকে ছুঁয়ে ফেলে।

যতক্ষণ দেখা যায় অন্ধকার ভেদ করে কোটাল কেষ্টর দিকে চেয়ে রইল।

আট

সকালবেলা দারোয়ানের ডাকে ঘুম ভাঙল কোটালের। দারোয়ান ধমক দিচ্ছিল, হিয়া কাহে শোয়া। গেটকা সামনে।

কোটাল ধড়মড় করে উঠে বসল। উঠে দেখে ভোর হয়ে গেছে। দু-একটা কাক বেরিয়েছে। কর্পোরেশনের লোক রাস্তায় জল দিচ্ছে। কোটাল উঠে গিয়ে রাস্তার কলে মুখ ধুতে গেল। মুখ ধুতে বসে দেখল, মামীমা গাড়ি করে বেরিয়ে যাচ্ছেন। কোটালের মামী এই সময় গড়ের মাঠে যান, প্রাতঃভ্রমণ করতে।

কোটাল দৌড়ে গিয়ে ডাকল, মামীমা, মামীমা……

মামীমা ডাক শুনে গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। দেখলেন, কালিঝুলি মাখা ছেঁড়া স্যাণ্ডো গেঞ্জী আর কালো প্যাণ্ট পরা একটি বাচ্চা ছেলে হাত তুলে তাকে ডাকছে। ছেলেটির ঘুম না হওয়া সারা চোখে জলের ছিটে। মাথার চুল উসকো খুসকো। বড় বড় চোখ দুটোয় ভয় আর উৎকণ্ঠা।

মামীমার ভ্রূ কুঁচকে গেল। ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললেন।

কোটাল গাড়ির জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, মামীমা আমি কোটাল। আমায় চিনতে পারছ না, আমি জামশেদপুরের কোটাল, কোটাল।

মামীমার ভ্রূ সমান হল। চিনতে পেরেছেন। কোটালের চেহারা দেখে অবাক হলেন।

কোটাল তখনও বুঝতে পারেনি মামীমা ওকে চিনতে পারল কিনা। উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, মামীমা, আমায় চিনতে পারছ না ?

মামীমা এবার ঘাড় নাড়লেন। কোটাল এতক্ষণে নিশ্চিত হল। তারপর মামীমার দিকে চেয়ে হাসল।

মামীমা বললেন, তুমি এখানে কেন ? তোমার মামা না তোমাকে কোথায় কোন গ্যারেজে দিয়ে এসেছিলেন কাজ শেখার জন্য। নিশ্চয়ই পালিয়ে এসেছ। এতক্ষণ ছিলে কোথায়। এই ফুটপাতে শুয়ে ছিলে নাকি ?

কোটাল বলল, ওখান থেকে বেরুতে দেয় না যে। তাই কাল রাতে এসেছি। তখন গেট বন্ধ ছিল, তাই এখানে শুয়েছিলাম।

মামীমা একটু বিরক্ত গলায় বললেন, চলে এলে কেন ?

কোটাল বুঝল এবার আসল কথাটা বলতে হবে। কিন্তু মামীমা যদি রাজি না হন। করুণ গলায় কোটাল বলল, মামীমা আমি স্কুলে ভর্তি হব। তুমি বাড়িতে যা করতে বলবে তাই করব।

কথাটা শুনে মামীমা প্রথমে ভ্রূ কুঁচকে চেয়ে রইলেন কোটালের দিকে। কোটালের বুক ধুকধুক করছিল।

মামিমা এবার একটু হাসলেন, স্কুলে পড়বে ?

কোটাল মাথা নাড়ল।

—আচ্ছা এখন বাড়ির ভেতরে যাও। আমি মাঠ থেকে ফিরে আসি, তারপর তোমার মামার সঙ্গে কথা বলব।

মামিমা দারোয়ানকে ডেকে বললেন, একে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাও।

তারপর মামীমার গাড়ি গড়ের মাঠে চলে গেল।

অনেক বেলায় মামা উপর থেকে নিচে নামলেন। মামীমা বোধ হয় এর মধ্যে মামার সঙ্গে কথা বলে রেখেছিলেন। কারণ মামার কথা শুনে সেইরকমই মনে হল।

মামার পরনে ছিল খুব দামী লাল ড্রেসিং গাউন, পায়ে ঘাসের চটি। মামা খুব গম্ভীর গলায় বললেন, তুই স্কুলে পড়তে চাস।

কোটাল মাথা নাড়ল। হ্যাঁ চায়।

মামা অনেকক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে বসে রইলেন। একটা মোটা চুরুট ধরালেন। তারপর বললেন, তোর ভালোর জন্যই তোকে গ্যারেজে দিয়েছিলাম। আজকাল লেখাপড়ার কোন মূল্য নেই। হাতের কাজ শিখতে পারলে কোনদিন ভাতের অভাব হয় না।

কোটাল চুপ করে বসে রইল। এসব কথার কী উত্তর দিতে হয় ও জানে না। একবার ভাবল বলে, তবে মা কেন বলত, লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হওয়া যায়। কিন্তু বলল না। মামার মুখের ওপর বলতে সাহসে কুলাল না।

কোটাল চুপ করে আছে দেখে মামা বললেন, লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে অনেকদিন সময় লাগে। স্কুলের গণ্ডী পেরুতে লাগে এগারো বছর। তারপর কলেজে আরো চার বছর। পনেরো বছর পর বি এ পাস করে বেরুলেও যে একটা চাকরি হবে তার কোন গ্যারাণ্টি নেই। ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ারও আজকাল চাকরি পায় না।

তাছাড়া পনেরো ষোল বছর ধরে একটি ছেলে স্কুলে কলেজে পড়বে তখন তার একজন গারজেন দরকার হয়। তোর গারজেন কে হবে। আমরা আর বেশিদিন এই দেশে নেই। তোর মামীমার ইচ্ছা শেষ

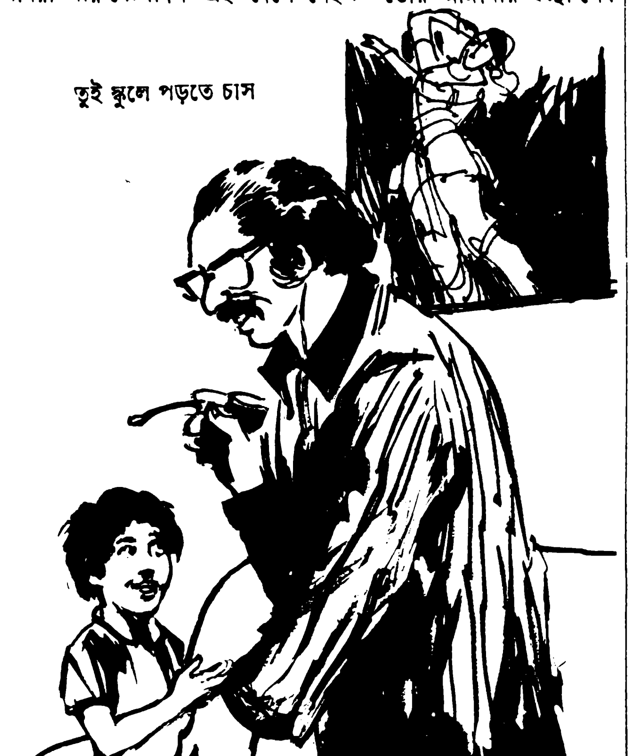

তুই স্কুলে পড়তে চাস

কটা দিন ইউরোপ আমেরিকায় ঘুরে বেড়ান। বছর দুয়েকের মধ্যেই আমরা বেরিয়ে যাব। তখন তোর গারজেন কে হবে।

আমি চারদিক ভেবেই তোকে সিংজীর গ্যারেজে দিয়েছিলাম। যাইহোক, তোর মামীমা বলল, তোর নাকি স্কুলে পড়ার খুব ইচ্ছে। বেশ যা তবে স্কুলে। দু-চারদিন স্কুলে গিয়ে দেখ। সুবিধে না বুঝলে আবার সিংজীর গ্যারেজে ফিরে যাস।

মামার বাড়ির সরকার গোছের একজন লোক, তার নাম মদনদা, তিনি কোটালকে নিয়ে গেলেন স্কুলে ভর্তি করাতে। কর্পোরেশনের একটা ফ্রি স্কুলে ভর্তি হল কোটাল। পরীক্ষা করে হেড দিদিমণি ওকে ক্লাস থ্রিতে ভর্তি করে নিলেন।

মামার বাড়ির নিচের তলায় রান্নাঘরের পাশে একটা গুদাম ঘরের মত জায়গায় কোটাল থাকতে পেল। জায়গাটা কোটালের ভাল লেগে গেল।

স্কুল থেকে কিছু বই পেল কোটাল বিনি পয়সায়। বাকি দু-একটা বই সরকার মদনদাকে বলাতে তিনি কিনে দিলেন। সেই দু টাকা দিয়ে কোটাল নিজেও একটা বই কিনল। আর সেই বইয়ের মলাটে বাচ্চা-বাবার নাম লিখল।

একটা নতুন ধরনের জীবন পেয়ে কোটালের মন্দ লাগছিল না।

তবে রাত্রে ঘুমের খুব অসুবিধে হয়। গুদামঘরে ইঁদুরের ভীষণ উৎপাত। একদিন একটা ধেড়ে মত ইঁদুর কোটালের পায়ের এক খোবলা মাংস তুলে নিয়ে গেল।

নয়

স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকেই কোটাল বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সুযোগ খুঁজছিল। কিন্তু সময় পাচ্ছিল না। স্কুলে পড়াশুনা অনেক এগিয়ে গেছে। বাড়িতে বসে সেসব পড়ে কোটালকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। তাই ছুটির পরও বাড়িতে এসে কোটালকে সর্বক্ষণ বই নিয়ে বসে থাকতে হয়। স্কুলের দিদিমণিরা দু চারদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছে কোটাল কি ধরনের ছেলে। দিদিমণিরা ওকে উৎসাহ দেয়, তোমাকে ফার্স্ট হতে হবে, মনে রেখ কোটাল।

কোটাল খুব মন দিয়ে পড়াশুনা শুরু করেছে। ফার্স্ট না হোক, রেজাল্ট যেন খারাপ না হয়।

কিন্তু বন্ধুদের জন্য ওর মনটা সব সময় খুব খারাপ হয়ে থাকত। একসময় একটু অভিমানও হল। ওরা বলেছিল, মাঝে মাঝে এসে ওকে দেখে যাবে। কই একবারও তো কেউ এল না। কদিন পর আবার নিজের থেকেই অভিমান কেটে গেল কোটালের। ভাবল, নিশ্চয়ই সিংজীর চোখ এড়িয়ে আসার সুযোগ পাচ্ছে না।

মাস তিনেক পর একদিন সুযোগ পেল কোটাল গ্যারেজে যাওয়ার। পরদিন কি একটা উপলক্ষ্যে স্কুল বন্ধ। এর মধ্যে কোটালও পড়াশুনা অনেকটা এগিয়ে রেখেছে। ফলত, কালকের সারাদিনটা বন্ধুদের সঙ্গে গ্যারেজে কাটালেও ওর ক্ষতি নেই। বহুদিন পর আবার একটু গাড়ি মুছতেও ইচ্ছে করল কোটালের।

সিংজী নিশ্চয়ই ওকে দেখে বিরক্ত হবে না। ও তো আর সিংজীর সম্পত্তি ছিল না। ওর মামা ওকে সিংজীর কাছে বিক্রি করেননি। তবে পালিয়ে এসেছিল এই জন্য যে, জানতে পারলে সিংজী আসতে দিত না।

বিকেলে সরকার মদনদাকে ডেকে কোটাল বলল, মদনদা, আমি আজ একটু বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গ্যারেজে যাচ্ছি। রাত্রিবেলা ওখানে থাকব। কাল বিকেলে ফিরব, কেমন।

মদনদা অনুমতি দিল।

কোটাল বলল, দেখ, মামা যেন জানতে না পারে আমি রাত্রে বাড়ি নেই।

মদনদা বলল, সে তোকে চিন্তা করতে হবে না। আমি ঠিক ম্যানেজ করে দেব।

পথঘাট এখন কোটালের অনেকটা চেনা হয়ে গেছে। সন্ধ্যে নাগাদ হাঁটতে হাঁটতে পার্ক সার্কাসের সিংজীর গ্যারেজে পৌঁছল।

কিন্তু গ্যারেজে গিয়ে যা শুনল তাতে ওর বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল। পায়ের নিচটা কেমন থর থর করে কাঁপতে লাগল। ও ওদের সেই পুরনো জায়গা গ্যারেজের পেছনে থপ করে বসে পড়ল।

কেষ্ট মারা গেছে। সিংজী পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। কোটাল যাওয়ার পর থেকেই নাকি কেষ্টর আর এখানে মন টিকছিল না। হাওড়ার দিকে কোথায় ও আবার একটা কাজ ঠিক করেছিল। দিন সাতেক আগে কেষ্ট পালিয়েছিল। বাচ্চা, সেলিম ওকে মানা করেছিল।

দিন চারেক আগে যথারীতি সিংজী আবার ওকে খুঁজে নিয়ে এসেছিল। তারপর গ্যারেজে নিয়ে এসেই প্রচণ্ড মার শুরু করেছে। আবদুলভাই ঠেকাতে গেছিল। পারেনি। উপরন্তু আবদুলভাই সিংজীর হাতে দু চার ঘা খেয়ে গেছিল। মুখ আর কান ফেটে রক্ত পড়ছিল কেষ্টর। দুদিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। কাল মাঝ রাতে মারা গেছে। মারা যাওয়ার আগে নাকি ও কোটালের নাম করছিল জ্বরের ঘোরে। মারা যাওয়ার পর সিংজী কেষ্টর লাশ গুম করে ফেলেছে। কাল শেষ রাতে কেষ্টর লাশ গাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে এসেছে। তারপর সিংজী গ্যারেজের সবাইকে ডেকে শাসিয়েছে, যদি কেউ এ ব্যাপারে কোথায় মুখ খোলে তবে তাকেও খুন করে ফেলবে সিংজী। ভয়ে সবাই চুপ মেরে আছে।

সেলিম বলল, সেই এলি কোটাল, দুদিন আগে আসতে পারলি না। তবে তো আর কেষ্ট পালাত না।

কোটাল বাচ্চার দিকে তাকিয়েছে। বাচ্চা সারাক্ষণে একটিও কথা বলেনি। ওর সমস্ত মুখ থম থম করছে। কোটালের মনে হল, বাচ্চা যেন এই দুদিনে হঠাৎ কেমন পাল্টে গেছে।

রাত্রে গ্যারেজের পেছনে সেই পুরনো জায়গায় ওরা শুল। কোন কথাবার্তা হল না। কোটাল ভেবে এসেছিল সমস্ত দিনটা কেমন আনন্দে কাটাবে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ওদের স্কুলের কত মজার মজার গল্প বলবে। কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। বালিশে মুখ গুঁজে কোটাল গুমরে গুমরে কাঁদছিল। কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে ও জানে না।

শেষ রাতের দিকে হঠাৎ খুব হৈ চৈ-এর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ওর। চোখ খুলে দেখে পাশে বাচ্চা নেই। ততক্ষণে সেলিমও উঠে বসেছে। দুজন দুজনের দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকাল। কি ব্যাপার চারদিকে এত হৈচৈ কেন। বাচ্চাই বা কোথায়।

উঠে গিয়ে যা দেখল তাতে ওদের হাত পা বরফের মত জমে যাবার দাখিল। বাচ্চাবাবা খুন করেছে সিংজীকে। সিংজী ওর ঘরের মধ্যে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। বুকে বিঘতখানেক এক ছোরা বসান। গল গল করে রক্ত পড়ছে তখনও। বাচ্চাকে কয়েকজন মিস্ত্রী জোর করে ধরে রেখেছে। ওর সমস্ত চেহারা কেমন উন্মত্ত পাগলের মত। চুল খাড়া খাড়া। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মুখে অস্ফুট স্বরে কী বিড় বিড় করছে।

সকালের দিকে পুলিশ এল। ধরে নিয়ে গেল ওদের সবাইকে। কোটাল, সেলিম আর বাচ্চাকে হাতে হাতকড়া দিয়ে, কোমরে দড়ি দিয়ে।

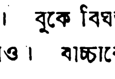

দশ

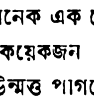

পুলিশের কাছে এবং আদালতে বাচ্চাবাবা বার বার বলল, সেই খুন

করেছে। এবং কেউ তাকে কোন সাহায্যও করেনি বা পরামর্শও দেয়নি।

কিন্তু পুলিশ সে কথা শুনল না। আবার বাচ্চাবাবাকে বাঁচাবার জন্য সেলিম বলল, খুন সেই করেছে।

কোটাল যে এর মধ্যে নেই পুলিশের একথা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। কারণ কোটাল তিনমাস গ্যারেজে ছিল না। কিন্তু যেদিন সিংজী খুন হল ঠিক সেই দিনই সন্ধেবেলা কোটালের আবির্ভাব হল গ্যারেজে। এই তিনজনেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল কেষ্ট। কেষ্ট সিংজীর হাতে খুন হয়েছে। অতএব এই তিন বন্ধু ষড়যন্ত্র করে সিংজীকে খুন করেছে। এবং যেহেতু কোটাল বাইরে থেকে সেই রাত্রে গ্যারেজে এসেছিল এবং বাচ্চাবাবা ও সেলিমের সঙ্গে একসঙ্গে শুয়েছিল অতএব এটা স্পষ্ট যে কোটালের পরামর্শই এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। তা না হলে বাচ্চাবাবা বা সেলিম আগেই সিংজীকে খুন করল না কেন।

কোটাল কোন প্রতিবাদ করল না। অবশ্য একজন ভাল উকিল দিলে কোটাল আর সেলিম ছাড়া পেয়ে যেতে পারত। কিন্তু ওদের হয়ে কে উকিল দেবে। সেলিমের তিন কুলে কেউ নেই। কোটালের এক মামা ছাড়া কেউ নেই। কিন্তু এই ঘটনার পর তিনি একদিনও কোটালের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেননি হাজতে এসে। এমনকি লোক মুখে একটা সংবাদ পর্যন্ত নেননি। কোটাল জানে, মামা বিশ্বাস করেছে সেও এর মধ্যে আছে। মামার বাড়ীর দরজার চিরকালের মত তার জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

বিচারে ওদের সবার জেল হয়ে গেল। বাচ্চাবাবার দশ বছর। সেলিমের আট বছর। আর কোটালের পাঁচ বছর। ওদের তিনজনকে রাজ্যের তিনটি বিভিন্ন জেলে পাঠান হল। কোটালকে কলকাতার কাছে একটা রিফরমেটরী জেলে পাঠান হল।

এগারো

পাঁচ বছর পর একদিন সকালে যখন কোটালের সামনে জেলখানার লোহার দরজা দুটো ঘর ঘর করে খুলে গেল তখন কোটালের মনে প্রথম যে প্রশ্নটা এল, সেটা হল, এবার কোথায় যাব!

মামার বাড়ীর দরজা তার জন্য চিরকালের মত বন্ধ। একটা জেল খাটা খুনে ছেলেকে মামা কখনই তার বাড়িতে আশ্রয় দেবেন না।

সিংজীর গ্যারেজে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

তাহলে!

বিশাল কলকাতা তার অসংখ্য লোকজন, অসংখ্য বাড়ীঘর নিয়ে তার সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এর একজন লোকেরও হাত কোটাল ধরতে পারে না, এর একটা বাড়িতেও কোটালের আশ্রয় নেই।

কোটাল ফুটপাত ধরে হাঁটতে লাগল।

সারাদিন কলকাতার পথে পথে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াতে লাগল কোটাল। আর খুব খিদে পেলে রাস্তার কলে হাত পেতে জল খেল। প্রায় সন্ধ্যার দিকে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে একটা পার্কের পাশে ফুটপাতে বসে পড়ল কোটাল। বসে ভাবতে চাইল, এরপর কী করবে ও। কোথায় থাকবে, কী খাবে।

ফুটপাতের ওপাশে কিছু ভিখিরি কাঠের আগুনে মাটির হাঁড়িতে রান্না চাপিয়েছে। ভাত সেদ্ধ হওয়ার ঘ্রাণ আসছে।

খুব খিদে পাচ্ছিল কোটালের আর খুব ঘুম। ওপাশে দুটো মেয়ে-ছেলে ভিখিরি মারামারি জুড়েছে। এ ওর চুল ধরে নাচছে। মুখে অশ্রাব্য খিস্তি চলছে। অন্য ভিখিরিরা ঘিরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। এই সুযোগে একটি ছোট মেয়ে উনুনের উপর থেকে ফুটতে থাকা ভাতের হাঁড়ি তুলে নিয়ে পার্কের ওদিকে কেটে পড়ল।

হঠাৎ কোটালের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। এইটুকু বয়েসেই অনেক দেখেছে ও। বুঝল মারামারি শেষ হওয়ার পর ওরা যখন দেখবে একজনের ভাত চুরি হয়ে গেছে তখন ওকে সন্দেহ করতে পারে। কারণ ও-ই ফুটপাতের নতুন আগন্তুক। তারপর সবাই মিলে ওকে মার শুরু করতে পারে।

কোটাল ঝুঁকি নিল না। আস্তে আস্তে উঠে পড়ে উল্টো দিকে হাঁটতে লাগল। বেশ অনেকটা আসার পর একটা গাড়ি বারান্দার নিচে ফুটপাতে শুয়ে পড়ল কোটাল আর শুয়ে পড়ার পরই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙল ওর। ঘুম থেকে উঠে ফুটপাতের চাপাকলে মুখ ধুল কোটাল। তারপর আবার উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে শুরু করল।

কিছু দূর যাওয়ার পর দেখল একটা কালীমন্দির। প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন ভিখিরি সেখানে সার বেঁধে বসে আছে। আর মারোয়াড়ীরা মন্দির থেকে প্রণাম সেরে বেরিয়ে প্রত্যেক ভিখিরিকে পাঁচটা করে পয়সা দিচ্ছে। কোটালের একবার লোভ হল ওই সারির মধ্যে গিয়ে বসে। কিন্তু নিজেকে সামলাল। শেষ পর্যন্ত ভিক্ষা! না, ওটা ত শেষ আশ্রয় হিসাবে আছেই, তার আগে দেখা যাক অন্য কিছু করা যায় কিনা। ভিখিরি হতে কোটালের বড় লজ্জা করে।

কোটাল মনে মনে ঠিক করল, এইভাবে রাস্তায় রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন ঘুরে না বেড়িয়ে ও কাজ খুঁজবে। কেষ্ট হোটেল রেস্টুরেন্টে খুব কাজ পেত। ওসব জায়গায় নিশ্চয় কাজ পাওয়া যায়।

কোটাল হাঁটতে হাঁটতে সামনে একটা বড় রেস্টুরেন্ট মত পেল। দোনোমনা করে সেখানে ঢুকে পড়ল। ঢোকার মুখে ক্যাশ বাক্স নিয়ে মালিক বসে। কোটালকে ঢুকতে দেখে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল।

—কি চাই।

—কাজ হবে।

কোটাল কাজ করতে চায় শুনে মালিক অনেকক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে কোটালের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। তারপর জিজ্ঞাস্য করল, এর আগে কোথাও কাজ করেছিস?

কোটাল মাথা নাড়ল। করেছে।

—কোথায়?

—একটা গ্যারেজে।

—কাজ ছাড়লি কেন?

এবার কোটাল বিপদে পড়ল। কি বলে। মালিক তাড়া দিল, কিরে চুরি করেছিলি বুঝি?

—না।

—তবে?

—পুলিশে ধরে নিয়ে গেছিল।

—পুলিশে! কেন?

—আজ্ঞে, সিংজী খুন……

—খুন! ওরে বাবা। বেরো বেরো এখান থেকে।

মালিক ক্যাশবাক্স ছেড়ে প্রায় দৌড়ে মারতে এল ওকে।

কোটাল তাড়াতাড়ি ফুটপাতে নামল।

আবার হাঁটতে লাগল। কোটাল বুঝল, গ্যারেজ অধ্যায়টা বেমালুম চেপে যেতে হবে। তা না হলে কাজ হবে না।

ঘুরতে ঘুরতে কোটাল আর একটা দোকানে ঢুকল।

—কাজ হবে?

—হবে।

মালিক হিসেবের লাল খেরো খাতা থেকে চোখ না তুলেই উত্তর করল।

কাজ হবে শুনে কোটাল আশান্বিত হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু মালিক হিসেবের খাতা থেকে আর চোখ তোলে না। প্রায় কুড়ি মিনিট পর চোখ তুলে কোটালকে আপাদমস্তক দেখল একবার। বোধ-

হয় পছন্দ হল।

জিজ্ঞাসা করল, ঠিকানা কি ?

—আজ্ঞে।

—থাকা হয় কোথায় ?

—আজ্ঞে, কোথাও থাকার ঠিক নেই।

মানে, কোথাও কাজ হলে সেখানে......

—ফুটপাতে থাক ?

কোটাল মাথা নাড়ল। থাকি।

—কাজ হবে না। ফুটপাতের ছেলেদের এখানে কাজ নেই। চুরি করে পালালে তোকে ধরতে যাব কোন ফুটপাতে। শ্যামবাজারে না বাগবাজারে।

—আজ্ঞে আমি ত চুরি করি না।

—ও ওরকম সবাই বলে। তারপর আমার এক ডজন চামচ ঝেড়ে নিয়ে কেটে পড় আর কি। না, না, পথ দেখ, এখানে কাজ হবে না।

অগত্যা। কোটাল আবার পথে নামল। পথে নেমে পেট ভরে জল খেল। এখন জল খেলে পেট চিন-চিন করে ব্যথা করছে। দু'দিন ধরে পেটে কিছু পড়েনি। এখন আর ঠিক খিদে পাচ্ছে না কোটালের। শুধু শরীর খুব দুর্বল লাগছে। মাথা ঝিম ঝিম করছে। সন্ধের দিকে আবার একটা পার্কের পাশে ফুটপাতে শুয়ে পড়ল কোটাল। শুয়ে শুয়ে সাত-পাঁচ নানা কথা মাথায় আসছিল কোটালের। কিন্তু কোন কথাই খুব গভীর দাগ ফেলছিল না। আসলে খিদেয় তৃষ্ণায় মাথা খুব গরম হয়ে আছে। মাথা কোন কাজ করছে না। অস্পষ্ট ছবির মত দ্রুত চিন্তাগুলি মাথায় আসছিল, যাচ্ছিল। এই

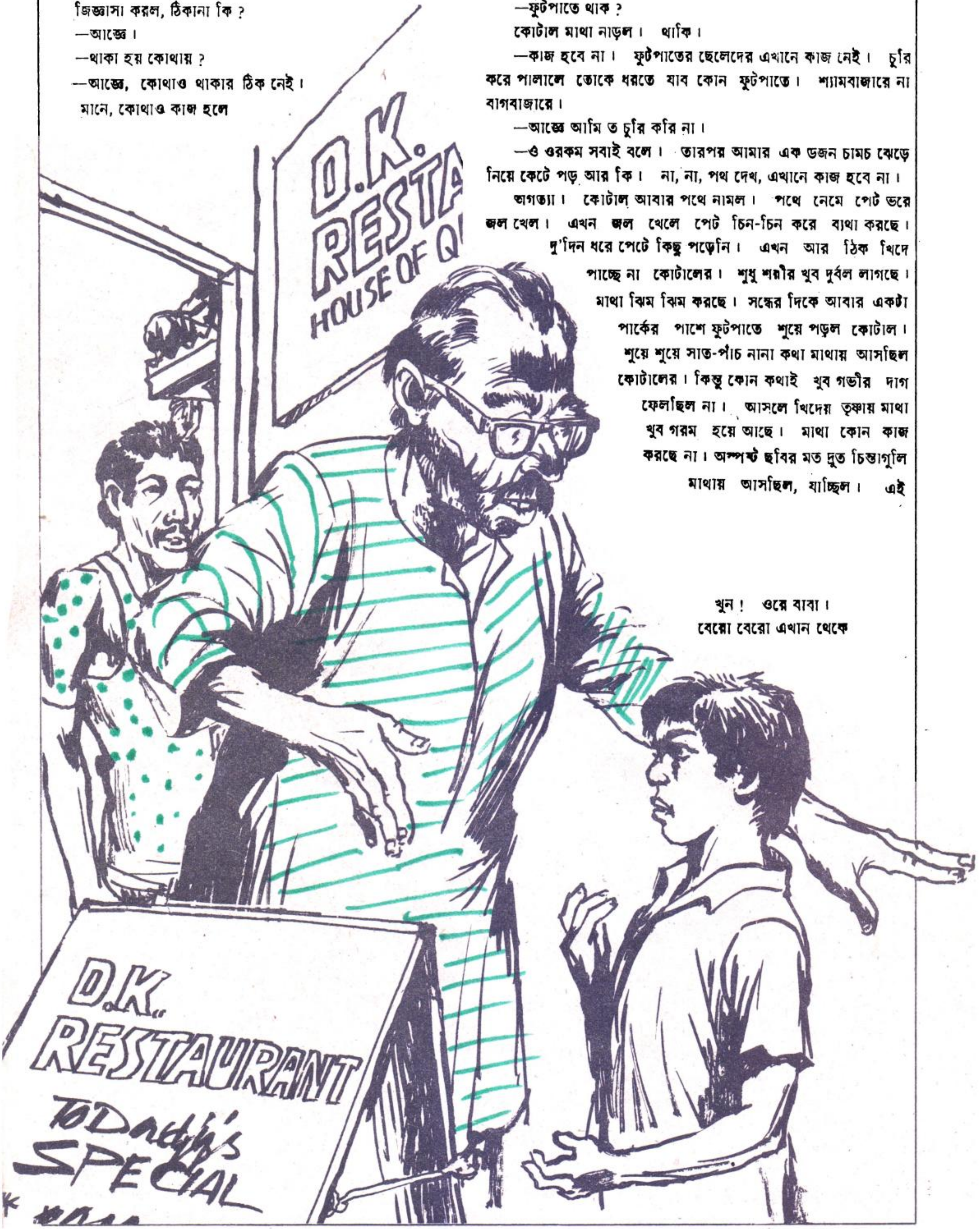

সময় হঠাৎ ওর মালুর কথা মনে পড়ল।

মালু ওর সঙ্গে জেলে ছিল। ওর অবশ্য মেয়াদ ছিল একবছরের। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল ও। জেলে ওর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল কোটালের। মালু বলেছিল জেল থেকে বেরিয়ে কোটাল যেন ওর সঙ্গে দেখা করে। তাহলে ওর কাজের অসুবিধে হবে না। মালু জর্জদার দলের ইনফরমার। জর্জদা খুব বড় ওয়াগন ব্রেকার দলের লীডার। মালু উল্টাডাঙ্গা লাইনের ধারে একটা বস্তির ঠিকানা দিয়েছিল।

কোটাল ঠিক করে ফেলল, কাল মালুর সঙ্গে দেখা করবে ও।

বারো

উল্টাডাঙ্গা লাইনের ধারের বস্তির মধ্যে মালুর বাড়িটা খুঁজে বের করল ও। মাটির দাওয়ার ওপর দরমার বেড়া দেওয়া ছোট বস্তি ঘর। একজন বয়স্ক মহিলা বাইরে বসে গুল দিচ্ছিল। কোটাল তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, এটা মালুদের বাড়ি।

মহিলা গুল দেওয়া বন্ধ করে কোটালের দিকে তাকাল। তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর মাথা নেড়ে জানাল হ্যাঁ, এটা মালুদের বাড়ি।

—মালু আছে?

—কেন, কি দরকার।

কোটালের হঠাৎ মনে হল, এ মালুর মা। বলল,—আপনি মালুর মা।

মহিলা আবার নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানাল, তিনিই মালুর মা বটে।

কোটাল তখন ওকে সমস্ত কথা খুলে বলল। বলল, আজ তিনদিন সে কিছু খেতে পায়নি। মালুর সঙ্গে দেখা করে একটা কিছু কাজ পেলে সে খেতে পাবে।

মালুর মা পাশে রাখা মাটির হাঁড়ির জলে হাত ধুয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর কোটালকে বলল, এসো, ভেতরে এসো।

কোটাল পেছন পেছন ঘরের ভেতরে ঢুকল। মালুর মা একটা ছেঁড়া গামছা ওর হাতে দিয়ে বলল,—পেছনে একটা পুকুর আছে, যাও ডুব দিয়ে এসো।

মালুর মার ব্যবহারে কোটাল খুব অবাক হল। বলল,—মাসিমা, মালু কোথায়?

—বলছি, তুমি ডুব দিয়ে এসো। কোটাল পেছনের পুকুরে ডুব দিয়ে এসে দেখল, ঘরের মাঝে একটা পিঁড়ি পাতা, পিঁড়ির সামনে একটা এ্যালোমিনিয়ামের থালায় পান্তা ভাত বাড়া। ভাতের উপর কটা ডালের বড়া। থালার সামনে মালুর মা বসে। ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে চার পাঁচটা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে ওকে দেখছে। প্রত্যেকের খালি গা, কেউ কেউ লেংটা, ধুলো মাখা। কোটাল আন্দাজ বুঝল, এরা মালুর—ভাইবোন।

মালুর মা বলল—বস, খেয়ে নাও।

কোটালের খিদে পেয়েছিল। তবু জিজ্ঞেস করল, মাসিমা, মালু বুঝি বাড়ি নেই। মাসিমা নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

বিকেলের দিকে উল্টাডাঙ্গা বস্তি ছেড়ে বেরোল কোটাল। আবার সেই উদ্দেশ্যহীন হাঁটা। তবে এবার পেট ভরা। এখনও মালুর মার কান্না ওকে তাড়া করছে।

মালু পুলিশের গুলিতে মারা গেছে দু'বছর আগে। জর্জদার ওয়াগন-ব্রেকার দলের সঙ্গে সেদিন রাত্রে এ্যাকশনে বেরিয়েছিল মালু। তারপর আর ফিরে আসেনি। পরদিন সকালে খবর পেয়ে মালুর মা গিয়ে দেখে, লাইনের ধারে রক্তে ভেজা মালুর প্রাণহীন দেহ।

হাঁটতে হাঁটতে আবার সেই পার্কের পাশে এসে শুয়ে পড়ল কোটাল। শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগল। এভাবে চলে না। যে ভাবে হোক জীবিকা অর্জনের একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু কিভাবে। এইসব চিন্তা করছিল কোটাল। তবে কদিনের চেয়ে আজকে মাথা অনেক ঠাণ্ডা। কেননা, আজ পেট ভরা। তাই ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতিটা বিচার করতে পারছিল কোটাল।

মালুর জন্য ওর দুঃখ হচ্ছে। এখনও মালুর মুখটা ও স্পষ্ট মনে করতে পারে। ভীষণ হাসি খুশি আর চটপটে ছিল ও। জেলে সবাইকে মাতিয়ে রাখত। তবু, মনে মনে কোটাল ভেবে দেখল, মালুর সঙ্গে দেখা হল না ভালই হল। মালু ওকে জর্জদার ওয়াগন ভাঙা দলে ভীড়ে যেত বলত। কিন্তু কোটালের এখনো চোর কিংবা ভিখিরির দলে ভীড়ে পড়তে মন চাইছে না। দেখা যাক না আর কটা দিন। তারপর চোর কিংবা ভিখিরির জীবন তো পড়েই আছে।

আজ ফুটপাতে শুয়ে পড়া মাত্রই ঘুম আসছিল না কোটালের। ফুটপাতে চিৎ হয়ে শুয়ে সোজা আকাশটাকে দেখা যায়। এখানে পার্ক থাকার দরুণ, কলকাতার বড় বড় বাড়িতে আকাশ ঢাকা পড়েনি। আকাশে জ্বল জ্বল করছে অসংখ্য তারা। আকাশের দিকে তাকালে এক অপার রহস্য কোটালের বুকের ভেতর গুড় গুড় করে ওঠে। মনে হয় শুধু চোর বা ভিখিরি হওয়ার জন্য মানুষ পৃথিবীতে আসেনি।

অনেক রাত্রে, এগারোটা সাড়ে এগারোটা নাগাদ প্রায় কোটালের বয়সী একটি ছেলে এল। বগলে চটের বিছানা। কোটালের পাশে ফুটপাতটুকু গামছা দিয়ে পরিষ্কার করে নিল, তারপর, চট বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। শোয়ায় কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়ল।

কোটাল এর আগের দিনেও ছেলেটিকে দেখেছে। কিন্তু কোন মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। কিন্তু আজ ছেলেটিকে দেখে কোটালের চিন্তা অন্যদিকে ধাবিত হল। কোটাল ভাবল, ছেলেটি ত ভিখিরি দলের নয়। চোরের দলেরও নয় নিশ্চয়ই। কেননা যারা চোর তাদের একটা আশ্রয় থাকে। তারা ফুটপাতে এসে শোয় না। তবে ছেলেটি কী। কি করে জীবিকা অর্জন করে ও। কি করে বেঁচে আছে ও। কোটাল মনে মনে ঠিক করে ফেলল, কাল ওকে অনুসরণ করবে ও। জেনে নেবে ফুটপাতে যারা থাকে তারা কিভাবে জীবিকা অর্জন করে।

তের

মনে মনে একটা উত্তেজনা থাকার দরুণই বোধহয় কোটালের পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখল, পাশের ছেলেটি তখনো জাগেনি। কোটাল উঠে গিয়ে কর্পোরেশনের কলে মুখ ধুয়ে এল। তারপর আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে শুয়ে পড়ে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে লাগল ছেলেটির ঘুম ভাঙার জন্য।

অল্পক্ষণ পরেই ছেলেটির ঘুম ভাঙল। উঠে গিয়ে কলে মুখ ধুয়ে এল। তারপর নিজের চটের বিছানাটা গুটিয়ে বগলে তুলে হাঁটা দিল।

কোটাল ফুটপাত ছেড়ে উঠে পড়ে ছেলেটির পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করল। ছেলেটি কিছুক্ষণ পর শেয়ালদা স্টেশনে এসে পৌঁছাল। এত ভোরেও শেয়ালদা স্টেশন ব্যস্ততায় ভেঙে পড়েছে। ছেলেটি শেয়ালদার মোড়ে একটা মিষ্টির দোকানে ঢুকল। সেখানে শালপাতার ঠোঙায় কচুরি জিলিপি খেল। পেট ভরে জল খেল তিন গ্লাস। দোকান থেকে বেরিয়ে এসে বগলে জড়ান বিছানাটা দোকানের সিঁড়ির নিচে ইট চাপা দিয়ে রেখে দিল। তারপর ছেলেটি শেয়ালদার ওই ভিড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ট্রামে করে, বাসে করে, ট্যাক্সিতে, রিক্সায়—অসংখ্য ফড়ে, ব্যবসায়ী, যাত্রী এসে থামছে শেয়ালদার মোড়ে। তাদের কারো সঙ্গে ইয়া বড় কাপড়ের গাঁটরি, কারো সঙ্গে বিরাট টব, কারো সঙ্গে বড় বড় থলি ভর্তি ধূপবাতি বা গেঞ্জীর প্যাকেট। ওই ছেলেটির মত আরো কিছু ছেলে ওইভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাল সহ কেউ এসে পৌঁছান মাত্র ওরা দৌড়ে গিয়ে যে কেউ একজন সেই মাল দখল করছে। তারপর চার

আনা কিংবা আট আনা মজুরী ঠিক করে, মালের গাঁটরি মাথায় তুলে স্টেশনে পৌঁছে দিচ্ছে।

কোটাল মুগ্ধ হয়ে গেল। বাঃ, হাতের কাছে এমন সুন্দর একটা জীবিকা থাকতেও সে অন্ধ হয়েছিল। সে মনে মনে ছেলেটাকে ধন্যবাদ দিল। তারপর জয় মা দুর্গা বলে সেও ঝাঁপিয়ে পড়ল ভীড়ে।

ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হল কোটালের। ওর নাম, রঙ্গ। ওর মা ভিখিরি। হাওড়া ব্রীজের নিচে থাকে। রঙ্গর ভিক্ষে ভাল লাগে না, তাই এই কাজে নেমে পড়েছে। কোটালকে খুব সাহস দিল ও। বলল, কেউ যদি কোটালকে কিছু বলে তবে কোটাল যেন ওকে বলে। কোটাল ঘাড় নেড়ে জানাল জানাবে।

প্রথমদিন একটাকা বারো আনা উপার্জন করল কোটাল। চমৎকার। রাত্রে কোটাল আর রঙ্গ একসঙ্গে হিন্দুস্থানী দোকানে বসে পেটভরে ডাল-রুটি খেল, জল খেল, তারপর ফিরে চলল নিজেদের ডেরায়, পার্কের পাশে সেই ফুটপাতে।

মাস তিনেক পর একদিন রঙ্গ জানাল, সে গোটা পঞ্চাশ টাকা জমিয়েছে। এবার সে তরকারী নিয়ে বসবে। ব্যবসা করে বড় হবে। কোটালকেও বুদ্ধি দিল, রোজ কিছু কিছু করে জমাতে।

রঙ্গ প্রথম দিন ডাব নিয়ে বসল শেয়ালদার ফুটপাতে। দুদিন পর তরমুজ নিয়ে। তারপর আলু আর ঝিঙে নিয়ে। মাস তিনেক বিভিন্ন তরকারীতে ঘোরাফেরা করে রঙ্গ এখন পার্মানেণ্টলি গামছা নিয়ে বসে। বাঁকুড়া থেকে গামছা নিয়ে এসে ফুটপাতে বসে বেচে। রঙ্গ এখন আর ফুটপাতে থাকে না। বেলেঘাটার দিকে কোন বস্তিতে গিয়ে উঠেছে।

এই ছমাসে কোটাল তিরিশ টাকা জমিয়েছিল। সেও ব্যবসায় নেমে পড়বে পড়বে ভাবছিল। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে প্যাণ্ট কাটা। টাকা হাওয়া।

রঙ্গ ওকে সান্ত্বনা দিয়েছে। বলেছে, ফুটপাতে থাকতে হলে একটু সাবধানে থাকতে হয়। তবে মাঝে মাঝে ওমন চোট হয়। তারও হয়েছিল। চোট হলে, টাকাটা মায়ের ভোগে গেছে ভেবে নিতে হয়। যাক কোটাল যেন মন খারাপ না করে। টাকা আবার জমিয়ে ফেলবে ও।

এইভাবে একরকম মন্দ কাটছিল না দিনগুলি। এরই মধ্যে এক-দিন মাঝরাতে স্বপ্ন দেখে উঠে কোটাল লোহা চোরদের হাতে বেদম মার খেল পার্কের পাশে।

চোদ্দ

খুব ভোরের দিকে আস্তে আস্তে জ্ঞান এল কোটালের। সমস্ত শরীরে ব্যথা। মাথা এখনও ঝিম ঝিম করছে। কোটাল উঠে বসতে গেল। প্রথম চেষ্টায় পারল না। থুতনীর পাশে কিছু একটা চ্যাট চ্যাট করছে। কোটাল ভাবল, বুঝি কাদা লেগেছে। হাতের চেটো দিয়ে মুছতে গিয়ে দেখে কাদা নয়, রক্ত। বাঁদিকের চোখটা বোধ হয় খুব ফুলেছে, খোলা যাচ্ছে না।

কোটাল আস্তে আস্তে ফুটপাতে ভর দিয়ে উঠল। উঠে গিয়ে সামনের কলে মুখ ধুল। থুতনীর রক্ত ধুল আস্তে আস্তে। তারপর পার্কের যেদিকে ছায়া পড়েছে সেদিকে গিয়ে বসল।

আজ আর কাজে বেরুতে পারবে না। সমস্ত শরীরে ব্যথা। তবে উপোষ করার ভয় নেই। জমানো দশটা টাকা আছে। সেটা ভেঙে খেতে পারবে।

কোটাল পার্কের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে বসে নিজের মূর্খামির জন্য নিজেকে গালাগালি করল। কতবার ওকে সবাই বলেছে, রাত্রে চলা-ফেরা করতে হলে চারদিকে চোখ রেখে চলতে হয়।

চারদিকে চোখ রেখে সাবধানেই চলে ফেরে কোটাল। কিন্তু কি যেন হল কাল। আসলে ওই স্বপ্নটাই যত নষ্টের গোড়া। যতবার ও ওই স্বপ্নটা দেখেছে ততবার ও কেমন ঘোরের মধ্যে দিন কাটিয়েছে। একটা মাথা নেই, মুণ্ডু নেই, অর্থহীন স্বপ্ন কেন যে ওকে তাড়া করে ফিরছে কোটাল বোঝে না।

একসময় পৃথিবীর যাবতীয় ছিঁচকে চোরদের ওপর ওর ভীষণ রাগ হল। কোটাল মনে মনে ঠিক করল, বাচ্চা আর সেলিম জেল থেকে বেরুলে ও একটা দল গড়বে। যাদের কাজ হবে, যেখানে যত ছিঁচকে চোর আছে তাদের খুঁজে খুঁজে ধোলাই দেওয়া। কালকের ওই দলটাকে ধরে ও, সেলিম আর বাচ্চা ভীষণ পিঠছে এইরকম একটা দৃশ্য কল্পনা করে কোটাল মনে মনে বেশ তৃপ্তি পেল।

দুপুরবেলা উঠে গিয়ে কোটাল ছাতুওলার কাছে একথালা ছাতু খেয়ে এল। ফুটপাতে ফিরে এসে প্রথমে ভাবল, একটু ঘুমোবে। গায়ে হাতে পায়ের ব্যথা এখন অনেকটা কম। শরীর অনেক সুস্থ। কোটাল শুল, কিন্তু ঘুম এল না।

শুয়ে পড়তে ওর মাথায় নানা চিন্তা ভর করে এল। কিন্তু কিছু-ক্ষণের মধ্যেই আর সব চিন্তা সরিয়ে সেই স্বপ্নটা দখল করে নিল। কোটাল জানে এটা বাজে স্বপ্ন, এর কোন মানে নেই। কিন্তু কখনো কখনো কোটালের অন্য একটা মন বলে, এর মানে আছে। কিছু একটা রহস্য আছে। কিন্তু কি সেটা কোটাল জানে না।

সামনের সিনেমা হলটাতে একটা নতুন ছবি এসেছে। দুপুরের শো'য়ে বেশ ভিড়। তার বয়সী কিছু ছেলে টিকিট ব্ল্যাক করছে। ওদের সবাইকে ও চেনে। ওদের মধ্যে রহমানও আছে। রহমান কোটালকে টিকিট ব্ল্যাকের লাইনে আসতে বলেছিল। ভাল পয়সা। কিন্তু কোটালের ওসব পছন্দ নয়। কেন জানি ভাল লাগে না।

এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কোটালের বোধহয় একটু ঝিমুনি এসেছিল। হঠাৎ একটি মেয়েলী গলার তীক্ষ্ণ চিৎকারে ও সোজা হয়ে বসল।

—চোর, চোর!

কোটাল দেখল, পার্কের কোনাকুনি দৌড়চ্ছে কালো মত খালি গায়ের একটি লোক। কোটাল লোকটিকে চেনে। এ অঞ্চলের কুখ্যাত ছিনতাইকারী। কাউকে পরোয়া করে না। দিনদুপুরে ছিনতাই করে।

কিন্তু হঠাৎ কি হল কে জানে, মুহূর্তের মধ্যে কোটালের শরীরে বিদ্যুৎ বয়ে গেল। কোটাল দেখল, পার্কের বাঁদিক দিয়ে গেলে ও সহজে লোকটাকে পেয়ে যাবে।

কোটাল রেলিং টপকে দৌড়ল। লোকটা ডানদিক দিয়ে ঘুরে আসতেই ও লোকটাকে পাশাপাশি পেয়ে গেল। কোটাল পাশ থেকে লোকটার পায়ে ল্যাং মারল। লোকটা ছিটকে পড়ল।

কোটাল জানে এবার আসল আক্রমণ আসবে। কোটাল তার জন্য প্রস্তুত হল। লোকটা মুহূর্তে পাক মেরে মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল। উঠতে উঠতেই কোমর থেকে ছোরা টেনে বের করল।

কোটাল এটারই অপেক্ষায় ছিল। তাই মুহূর্ত সময় না দিয়ে লাফ দিয়ে লাথি মারল লোকটার তল পেটে। লোকটা কঁক করে শব্দ তুলে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। হাতের ছোরা ছিটকে পড়ল ওদিকে।

এর মধ্যে হৈ চৈ করতে করতে সিনেমা হলের দিক থেকে একদল লোক এসে পড়েছে। ওরা লোকটাকে চেপে ধরল। কিল চড়-ঘুষি চলতে লাগল।

কোটাল ভীড় থেকে বেরিয়ে আসছিল। হঠাৎ চেখে পড়ল, বাঁদিকে রেলিং-এর ফাঁকে কালো ভ্যানিটি ব্যাগটা আটকে আছে। কোটাল ওটা তুলে নিয়ে সিনেমা হলের দিকে এগোল।

যে মেয়েটির ব্যাগ খোয়া গেছিল তাকে ঘিরে তখন কিছু লোক দাঁড়িয়ে। কোটাল বলল, এই নিন, এটাই বোধহয় আপনার ব্যাগ।

কিন্তু দেখা গেল মেয়েটির ব্যাগের চেয়ে কোটালের প্রতি আকর্ষণ বেশি। বিস্মিত গলায় বলল. কোটাল না!

কোটাল অবাক চোখ তুলল। আর চোখ তুলেই বিস্ময় আর আনন্দে স্তব্ধ। সিংজীর গ্যারেজের সেই হ্যারাল্ড গাড়ির দিদিমণি। যে তাকে একটা মস্ত বড় চকলেট বার দিয়েছিল। যেমন চকলেট সে কোনদিনও খায়নি। যাকে দেখে কোটালের মনে হয়েছিল, এমন সুন্দর মানুষ ও আগে দেখেনি। কোটাল অবাক হয়ে দেখল, উনি বুঝি এখন আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছেন।

কিন্তু এই নোংরা, ধুলোমাখা, ফুটপাতে থাকা, প্রায় পাঁচ বছর পর দেখা, কোটালকে উনি চিনলেন কি করে। ও'র দিকে চেয়ে কোটালের মনে হল, উনি যেন অধীর প্রত্যাশায় ওর পরিচয়ের স্বীকৃতিটুকুর জন্যই অপেক্ষা করছেন। ওনার কালো চোখ দুটোতে রাজ্যের উত্তেজনা ঝকঝক করছে।

কোটাল নরম গলায় বলল, আমি কোটাল। কিন্তু আপনি চিনলেন কি করে।

—কেন, তোমাকে ত আমি কুড়ি বছর পর দেখলেও চিনতাম। তোমার চোখ দুটো একটুও পাল্টায়নি। পাল্টাবেও না।

চোখ দিয়ে আবার লোক চেনা যায় শুনে কোটাল মনে মনে বেশ অবাক হল। ওদের চারপাশে বেশ ছোটখাট একটা কৌতূহলী জনতার ভীড় তৈরি হয়ে গেছে। কোটাল উত্তরে কি একটা বলতে যাচ্ছিল। ভীড়ের ভেতর থেকে কে একজন বলল, ছেলেটি আপনার চেনা বুঝি। উনি এতক্ষণে পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হলেন। চেয়ে দেখলেন তাঁদের চারপাশে অনেক মানুষের ভীড়। উনি লজ্জা পেলেন। বললেন, হ্যাঁ, চেনা। তারপর কোটালের হাত ধরে বললেন, এস কোটাল, আমার গাড়িতে এস। বাড়িতে বসে তোমার সঙ্গে গল্প করব। আমার অনেক কথা বলার আছে তোমাকে।

ওনার আবার কি কথা বলার থাকতে পারে তাকে, কোটাল ভেবে পেল না। কিন্তু উনি কেমন অবলীলায় তার নোংরা হাতখানা ধরে টেনে নিয়ে চলেছেন দেখে কোটাল আরো বেশি অবাক।

ওপাশের ফুটপাতে ওনার সেই হলুদ স্ট্যাণ্ডার্ড হ্যারাল্ডখানা পার্ক করা। দরজা খুলে কোটালকে সামনের আসনে বসালেন। তারপর

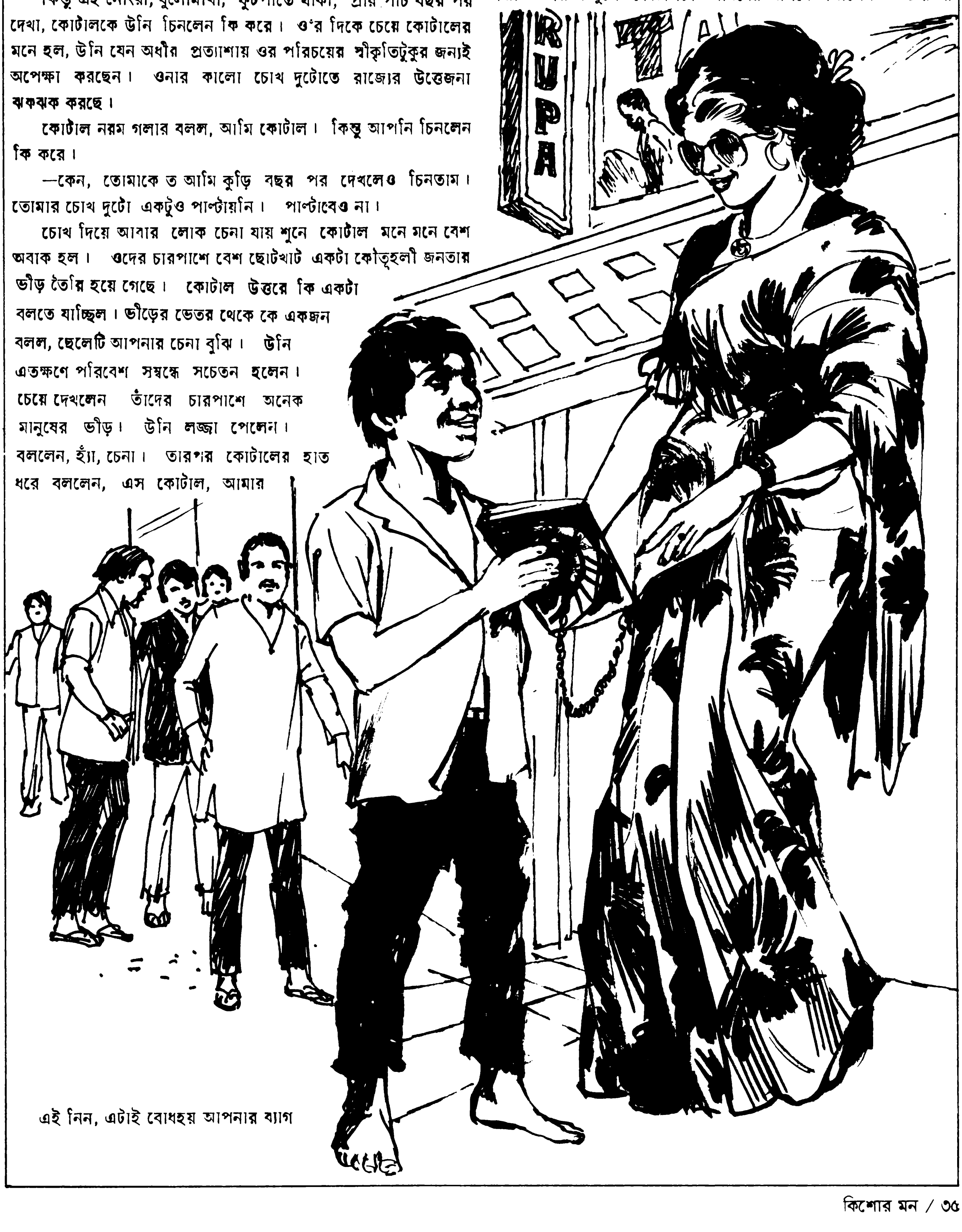

এই নিন, এটাই বোধহয় আপনার ব্যাগ

নিজে ওপাশের দরজা খুলে স্টিয়ারিং-এর নিচে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন।

—ভাগ্যিস আজ সিনেমা দেখতে এসেছিলাম আর, ভাগ্যিস ওই চোরটা আমার হাতের ব্যাগ টেনে পালিয়েছিল তাইতো তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। এখন ইচ্ছে করছে চোরটাকে ডেকে পাঁচ টাকা বখশিস করে দিই।

একটা বিরাট বাড়ির সামনে গাড়ি থামল। গাড়ি দেখে দারোয়ান লম্বা লোহার গেট খুলে ধরল। বাড়ির ভেতর ঢুকে কোটালের মনে হল, এরা ওর মামার চেয়েও বেশি বড়লোক।

একটা ঘরের ভেতর বসল ওরা। ঘরের মেঝে কার্পেট দিয়ে মোড়া। চারপাশে পুরু গদী মোড়া অনেকগুলি চেয়ার ছড়ান। ঘরে ফ্যান নেই কিন্তু ভেতরটা খুব ঠাণ্ডা। কোটাল ঠিক জানে না, তবে শুনেছে, এইরকম ব্যাপারকে নাকি এয়ার কণ্ডিশানও বলে। ও দু-একটা সিনেমা হলে দেখেছে।

ঘরে ঢুকে উনি বললেন, একটু বস, আমি আসছি।

একটু পর উনি ফিরে এলেন রাজ্যের খাবার নিয়ে। প্লেটে বিস্কুট চকলেট, স্যাণ্ডুইচ, কেক, কোকাকোলা, আপেল, কলা, আখরোট, বাদাম।

খাবার টেবিলের ওপর ট্রেটা রেখে উনি বললেন, এবার বেশ জমিয়ে গল্প করা যাবে কেমন। নে, খেতে শুরু কর।

বলে নিজেই হাতে কটা বাদাম তুলে নিলেন।

কোটাল আবার অবাক। এই কিছুক্ষণ আগেও উনি ওকে তুমি করে বলছিলেন। এখন তুই করে বলছেন। কোটাল আড়ষ্ট গলায় বলল, আপনাকে কি বলে ডাকব?

—আমার নাম দেবযানী মুখার্জী। তুই আমাকে দেবযানীদি বলে ডাকিস। না, থাক, তুই আমাকে শুধু দিদি বলেই ডাকিস। তোর কোন দিদি নেই তো?

কোটাল মাথা নাড়ল। নেই।

—ব্যস, তবে আর কি। আজ থেকে আমি তোর দিদি। এবার তোর কথা বল।

—কী কথা!

—তোর জেলের কথা। জেল থেকে বেরোনর কথা। তারপরের কথা।

কোটাল চুপ করে রইল।

দেবযানী বললেন, জানিস, আমি তোর অনেক খোঁজ করেছিলাম। তোকে আমি কথা দিয়েছিলাম তোর সঙ্গে একদিন আলাপ করতে যাব। তুই নিশ্চয়ই ভেবেছিলি, সেটা শুধু কথার কথা। কিন্তু আমি কথা দিয়ে ফেলি না। তোকে প্রথমদিন দেখে আমার একটু অন্যরকম মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, গ্যারেজে কাজ করলেও, আসলে তুই ঠিক গ্যারেজে কাজ করার জন্য আসসনি। ওটা তোর ছদ্মবেশ। তোর ভেতরে অন্য কেউ আছে। যে তোকে অন্যরকম কিছু ভাবায়। তাই তোকে দেখে তোর সঙ্গে আমার আলাপ করার ইচ্ছে হয়েছিল। তারপর এই কটা বছর আমি সবসময় চেয়েছি তোর সঙ্গে আমার অন্তত একবার দেখা হোক।

যাক সে কথা। আমি তারপর একদিন গ্যারেজে গেছিলাম। সেদিন গেছিলাম শুধু তোর সঙ্গে দেখা করতেই। গিয়ে শুনলাম তুই চলে গেছিস। তোর মামার কাছে। তুই স্কুলে ভর্তি হয়েছিস। শুনে কী বলব, আমার কী আনন্দ হয়েছিল, বোঝাতে পারব না। মনে হয়েছিল, আমি ঠিকই চিনেছিলাম, এই ছেলেটা গ্যারেজে কাজ করতে আসেনি।

তুই যেখানেই থাক, ভাল থাক। লেখাপড়া করে অনেক ভাল হ' এই প্রার্থনা করে সেদিন চলে এসেছিলাম।

তারপর বেশ কিছুদিন পর একদিন আবার গেছিলাম গ্যারেজে কাজে। গিয়ে সব শুনলাম। শুনে বিশ্বাস হয়নি। তুই ওই কাজ করতে পারিস কিছুতেই বিশ্বাস হয়নি আমার। আমি জানতাম, আমি তোকে যেভাবে জেনেছি, তুই তাই। আর অন্যরকম কিছু তুই হতে পারিস না। তারপর থেকে তোর সঙ্গে একবার দেখা করতে চেয়েছি, যেভাবে হোক। তোর নিজের মুখে সব শুনব বলে।

এতক্ষণ একসঙ্গে কথা বলে দেবযানী থামলেন। শুনে কোটাল অবাক। তার সম্বন্ধে কেউ অমন জোর করে কিছু ভাবতে পারে কোটাল ভাবতেই পারে না। ওর মনের ভেতর কেমন সবকিছু পাল্টে যেতে লাগল। বোধহয় নিজের মায়ের পর এই প্রথম কোটাল কোথাও ওর সম্বন্ধে এমন বিশ্বাসের জোর অনুভব করল। বহুদিন পর আজ আবার কোটালের কান্না পাচ্ছিল। গলার ভেতর কি একটা দলাপাকান কষ্ট উসখুস করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দেবযানী বললেন কিরে তুই কিছু খাচ্ছিস না, কেন। খা।

কোটাল বলল, হ্যাঁ, এই যে খাচ্ছি।

কোটাল প্লেট থেকে একটা বিস্কুট তুলে নিল।

দেবযানী বললেন, এতক্ষণ আমার কথা বললাম। এবার তোর কথা বল।

কোটাল অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইল। ওর এই বারো বছরের জীবনটার ঘটনাবহুল ছবি মুহূর্তে ওর চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল। উঃ, কী অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ এই জীবন! কী দুঃখের, কী কষ্টের। কোটালের মনে হল, হ্যাঁ, এবার ও কাউকে ওর গল্প বলতে পারে। ওর ইচ্ছা, অনিচ্ছার কথাগুলি বলতে পারে, ওর স্বপ্নের কথাগুলি বলতে পারে। কিন্তু যে শুনতে পারে শুধু তাকেই বলতে পারে। আর দেবযানীদির চেয়ে ভাল শ্রোতা কোথায়।

কোটাল আস্তে আস্তে মুখ তুলল, বলল, প্রথম থেকে...... ?

দেবযানী ঘাড় কাত করে বললেন, একেবারে প্রথম থেকে।

কোটাল ওর গল্প শুরু করল। দশ নং বস্তি ঘরের সেই জীবন দিয়ে যার শুরু!

পনের

আমাদের গল্প শেষ হয়ে এসেছে। এর পরের ঘটনা খুব ছোট্ট আর খুব দ্রুত।

কোটাল দেবযানীদের বাড়িতে থেকে গেল। দেবযানী ছাড়লেন না ওকে। পরদিন দেবযানী কোটালকে ওর বাবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। ওর বাবা খুব বিখ্যাত ব্যারিস্টার। কোটালের গল্প শুনে আর কোটালকে দেখে উনিও মুগ্ধ। উনি চেয়েছিলেন, কোটাল দার্জিলিংয়ে কনভেন্টে ভর্তি হোক। ওখানে একটা হোস্টেলের ব্যবস্থাও করতে পারতেন উনি।

কিন্তু দেবযানী আপত্তি করেছেন। তিনি তাঁর ভাইকে তার কাছ-ছাড়া করবেন না। কোটালকে তিনি কলকাতারই এক স্কুলে ভর্তি করে দেবেন। আর কোটালের পড়াশুনার ভার আজ থেকে তাঁর ওপর।

দিন পনেরো পর দেবযানীদির হাত ধরে কোটাল কলকাতার এক বিখ্যাত স্কুলে ভর্তি হল।

স্কুলে ঢুকতে গিয়ে গেটের সামনে থমকে দাঁড়াল কোটাল। সেই মোরামে ঢাকা সরু কেয়ারী করা পথ। ফুল আর হেজ গাছ ঘেরা কম্পাউণ্ড ওয়াল। ভেতরে দুপাশে অজস্র ফুলের বাগান। আর সরু পথটুকু পার হয়ে স্কুলের সামনের ঘরটাতে লেখা 'হেডমাস্টার'। হেড-মাস্টারের ঘরে সাদা পর্দা ঝুলছে।

কোটালের মনে হল, এও কি সম্ভব!

দেবযানী বললেন, কি হল দাঁড়িয়ে পড়লি যে। চল, ভেতরে চল।

কোটাল ভেতরে ঢুকল।

—০—

ছবি : ছি সাহা

পুরস্কারের চেয়ে ভাইকে বাঁচানোর আনন্দ বেশি

শ্যামলেন্দু চৌধুরী

ব্রিজেশ পান

ব্রিজেশ এসেছিল তার দেশের বাড়ি সানমুড়ায়। সঙ্গে তার বাবা, মা এবং ছোট ভাই বুদ্রেশ। ওরা দীর্ঘদিন ধরেই মেদিনীপুরের বাসিন্দা। থাকে গড়বেতায়। ব্রিজেশের বাবা মনোরঞ্জন পান পঞ্চায়েত সমিতির ক্লার্ক। ছুটিছাটা পেলেই স্ত্রী, ছেলেদের নিয়ে দেশের বাড়ি ঘুরে যান। এবারও বাবার সঙ্গে সেরকম এসেছিল ব্রিজেশ। ফেরার পথেই বিপত্তি।

শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন সেটা। ইংরেজির ১৭ আগস্ট '৮২। সংক্রান্তির দিন বলে বাড়ির লোক এবং আশেপাশের পরিচিত অনেকেই ব্রিজেশের বাবাকে সেদিনই ফিরতে বারণ করেছিল। মনোরঞ্জনবাবু কারোর কথাই কানে নেননি। কেন না এসব সংস্কারে তাঁর একেবারেই আস্থা নেই। তাছাড়া গড়বেতায় জরুরী কাজও ছিল। ফিরে যাওয়া দরকার। ব্রিজেশরা তাই ফেরার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েই পড়ল। সঙ্গে দেশের বাড়ির দীর্ঘদিনের কাজের লোক বিনোদ মাজী।

বেশ কিছুটা পথ পায়ে হেঁটে শেষে নৌকো করে শিলাবতী নদী পেরিয়ে এপারে আসতে হবে ওদের। নদীর ঘাটে এসে ব্রিজেশ দেখল ভরা বর্ষায় শিলাবতী ফুঁসছে। যেমন স্রোত, তেমন টান। তবু তার ভেতরেই নির্বিঘ্নে নদী পেরল ওরা। নৌকো এসে লাগল এপারের খড়কুশমা জেলে ঘাটে।

নৌকো থেকে নেমে খানিকটা জলকাদা ভেঙে এগোলে তবে ডাঙা। এসব জায়গার ঘাটের অবস্থাই এরকম। নৌকো থেকে সরাসরি ডাঙায় আসা যায় না। খানিকটা জলকাদা ভাঙতেই হয়।

নৌকো থেকে প্রথমে নামে ছোট ভাই বুদ্রেশ। ব্রিজেশও নামে ভাইয়ের পেছন পেছন। ভাই বুদ্রেশ পাঁচ বছরের ছটফটে ছেলে। ডাঙায় আসতে পায়ে বেশ খানিকটা কাদা লাগে। দাদাকে জানিয়েই কাদা ধোয়ার জন্য খানিকটা পাশে সরতে থাকে সে। ব্রিজেশও কাদা ভেঙে এগোচ্ছিল। খুব সাবধানে। কেননা জলে চারপাশ সমতল হয়ে আছে। এসব জায়গার নদীর ঘাটের ধরনটা বেশ বিপজ্জনক। পায়ের নিচে কাদা জমি কোথাও এই আছে, কোথাও আবার হঠাৎ ধস খেয়ে খাদের মত নেমে গেছে। স্থানীয় লোক ছাড়া আর কারো পক্ষে জমির আন্দাজ পাওয়া সম্ভব নয়।

পা ধোয়ার জন্য এগোতে গিয়ে হঠাৎ এভাবেই জলের ভেতর ধসে গেল বুদ্রেশ। জল গভীর থাকার জন্য ঐ জায়গায় তখন বেশ ঘূর্ণি। নিমেষে বুদ্রেশ ঘূর্ণির ভেতর তলিয়ে গেল। ব্রিজেশ একটু দূরেই ছিল। ভাইকে ওভাবে পড়ে যেতে দেখে হতচকিত হয়ে গেল সে। সাঁতার জানে না ব্রিজেশ। বাবা মাকে ডাকার সময়ও নেই। ভাইকে বাঁচাতে নিমেষের মধ্যে সেও জলে ঝাঁপ দিল। ভাইয়ের দেহটা স্রোতের টানে এগিয়ে গেলেও একেবারে নাগালের বাইরে যায়নি। ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছে। ঝাঁপ দিতেই ব্রিজেশ ভাইয়ের দেহ হাতে পেল। শুনেছিল জলে ডোবা লোককে বাঁচাতে গেলে নাকি চুল ধরতে হয়। এত বিপদের মধ্যেও সে কথাটা ব্রিজেশের মনে পড়ল। মনে পড়তেই জলের ভেতর টাল খেতে খেতে ভাইয়ের চুল শক্ত মুঠিতে আঁকড়ে থাকল ব্রিজেশ। স্রোতের টান ওদেরকে ঠেলে দূরে নিয়ে যেতে চাইছে। জলের নিচে পাথরে শরীর ঘসটে যাচ্ছে বারে বারে। প্রাণপণ শক্তিতে ব্রিজেশ ভাইকে ধরে থাকল।

এদিকে ততক্ষণে পাড়ে হৈ চৈ পড়ে

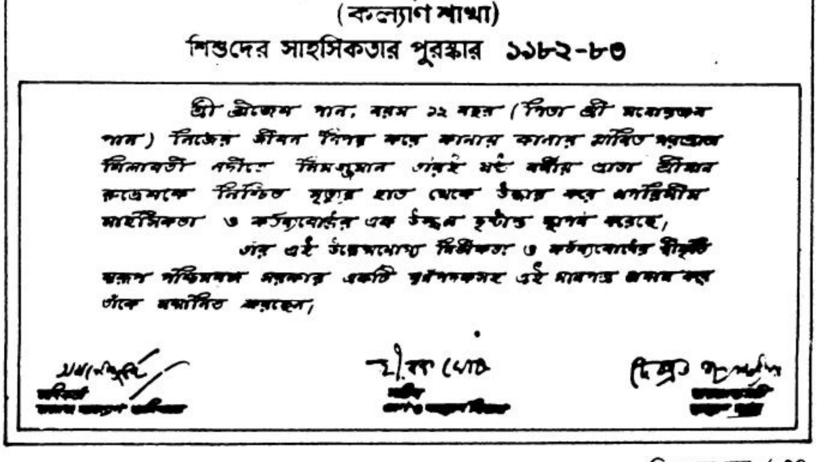
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগ
(কল্যাণ শাখা)
শিশুদের সাহসিকতার পুরস্কার ১৯৮২-৮৩

শ্রী ব্রিজেশ পান, বয়স ১২ বছর (পিতা শ্রী মনোরঞ্জন পান) নিজের জীবন বিপন্ন করে কানায় কানায় প্লাবিত খরস্রোতা শিলাবতী নদীতে নিমজ্জমান তাঁরই ছোট ভাই শ্রীমান রুদ্রেশকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে অপরিসীম সাহসিকতা ও কর্তব্যবোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে,

তার এই উল্লেখযোগ্য নির্ভীকতা ও কর্তব্যবোধের স্বীকৃতি স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি স্বর্ণপদকসহ এই মানপত্র প্রদান করে তাঁকে সম্মানিত করছেন,

গেছে। ব্রিজেশকে জলে ঝাঁপাতে দেখেছে অনেকেই। প্রথমেই ছুটে এসেছে বিনোদ মাজী। অকুতোভয় মানুষটা জলের ভেতর ঝাঁপও দিয়েছে। কোনক্রমে ওদের দুজনের কাছে পৌঁছে পাথরের খাঁজে পা দিয়ে দু ভাইকে ধরে ওঠার চেষ্টাও করেছে। কিন্তু প্রবল স্রোতের টান বিনোদ মাজীর সব চেষ্টাকেই ব্যর্থ করে দিয়ে তিনজনকেই দূরে ঠেলতে থাকে।

বিপদের গুরুত্ব বুঝে বাবা মনোরঞ্জনবাবু ভয়ে সিঁটিয়ে গেছেন। ব্রিজেশ-বুদ্রেশের মা ছেলেদের ভেসে যেতে দেখে আথালি পাথালি কান্না শুরু করেছেন। পাড়ে যাকেই দেখেন মনোরঞ্জনবাবু—মাঝি, সাধারণ লোক, সবাইকেই অনুরোধ করেন ছেলেদের বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু ঐ স্রোতে নামতে সাহস পায় না কেউ। ওরা তিনজন ভেসে যেতেই থাকে।

সেই মুহূর্তে প্রায় দেবদূতের মত এগিয়ে আসেন একজন মানুষ—কালীপদ খাঁড়া। দেউল কুন্দরায় থাকেন। খড়কুশমা প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। তিনি সেই প্রবল স্রোতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সাঁতরে তিনজনের কাছে গিয়ে তাদেরকে ধরে ঠেলে পাড়ের কাছে নিয়ে আসেন, এবং অবশেষে ডাঙায় ওঠেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচে প্রত্যেকে। পাড়ে ওঠার পর দেখা যায় প্রায় অচৈতন্য বুদ্রেশের চুল তখনও ব্রিজেশের শক্ত মুঠিতে ধরা। এত

ছোটভাই বুদ্রেশ পান

বিপদেও সে ভাইকে ছাড়েনি।

এই সুবাদে ব্রিজেশ এবার সরকারি পুরস্কার পেল। গত ১৮ মার্চ '৮৪ তারিখে '৮২—৮৩' সালের 'রেভারি অ্যাওয়ার্ড' দেওয়া হল ব্রিজেশকে। স্বর্ণপদক এবং মানপত্র দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্রিজেশের সাহসকে স্বীকৃতি দিলেন। যোগ্য বাছাই সন্দেহ নেই।

গড়বেতায় ব্রিজেশের বাড়িতে আমরা যখন গেলাম তখন আমাদের দরজা খুলে ভেতরে বসাল ব্রিজেশ নিজেই। সপ্রতিভ বারো বছরের ছেলে। গড়বেতা হাইস্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে।

ওকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাইকে বাঁচাবার জন্য জলে ঝাঁপ দিতে তোমার ভয় করেনি?

ব্রিজেশ অকপটে বলল, হ্যাঁ করেছিল।

—তবে ঝাঁপ দিলে কি করে?

ব্রিজেশের সরল উত্তর, জানি না। ভাইকে জলে পড়ে যেতে দেখেই মনে হল ওকে বাঁচান দরকার। আমিও ঝাঁপ দিলাম।

এর পরের ঘটনা তো আগেই বলেছি। যা সবই ব্রিজেশ নিজের মুখে আমাদের বলেছে। বাবা মনোরঞ্জনবাবু মাত্র একবারই আমাদের আলোচনায় ঢুকেছিলেন। বলেছিলেন, কালীপদবাবুর কথাটা দয়া করে একটু লিখবেন। সেদিন উনি না থাকলে আমার দুই ছেলের কাউকেই আর ফিরে পেতাম না। ওনার ঋণ এ জীবনে শোধ হবে না।

ব্রিজেশ আবৃত্তি করে। স্কুলের নাটকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় ওর বাঁধা। নিজে কবিতা লেখে। নাটকও লেখে। খাতা খুলে সব আমাদের দেখাল। ওর মেডেল, মানপত্র দেখতে চাইলাম। ভেতর ঘর থেকে তাও বের করে নিয়ে এল।

ব্রিজেশকে বললাম, মেডেল পেয়ে আনন্দ হয়নি?

উত্তর দিল ব্রিজেশ, হ্যাঁ হয়েছিল। তবে ভাইকে বাঁচাতে পেরে আনন্দ হয়েছিল আরও বেশি। □

ছবি: লেখক

ভিন্ন স্বাদের ভিন্ন রুচির পত্রিকা

খেলার আসর

দেশ বিদেশের তরতাজা খবর ও রচনা ছাড়াও

'খেলার আসরে'র পাঠক পাঠিকারা এখন প্রতি মাসে তাদের প্রিয় তারকাদের মুখোমুখি হচ্ছেন। মে মাসে মুখোমুখি হয়ে প্রশ্ন করতে পারবেন ফুটবলার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে। নিয়মাবলীর জন্য খেলার আসর দেখুন।

উদীয়মান ফুটবলারদের নানা সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছেন প্রাক্তন অধিনায়ক প্রদীপ চৌধুরী তার 'ফুটবল ক্লিনিক'-এ। □ লস এঞ্জেলেস ওলিম্পিকেসর প্রস্তুতি বের হচ্ছে কেবল খেলার আসরেই। □ খেলাধূলার প্রশ্নের জবাব 'জানাবেন কি?' বিভাগে। □ কিশোর প্রতিভাবানদের নিয়ে 'উদীয়মান'

বিশেষ কলকাতা ফুটবল সংখ্যা

১ মে খেলার আসর সাত পূর্ণ করে আট বছরে পা দিচ্ছে। এই উপলক্ষে ৪ মে সংখ্যা বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে। সংখ্যাটির বিশেষ আকর্ষণ কলকাতা ফুটবল নিয়ে একগুচ্ছ লেখা – কলকাতা ফুটবলে তিন প্রধানের ভূমিকা। কলকাতার ফুটবল নিয়ে কারা কী ভাবছেন? দর্শকরা কী চাইছেন, কী পাচ্ছেন? কলকাতার ফুটবলকে বাঁচাতে হলে কী করা দরকার? কলকাতা ফুটবলে কোচদের ভূমিকা।

অতীতের কলকাতা ফুটবলের স্মরণীয় ঘটনার স্মৃতি মন্থন, কয়েকজন নামী প্রাক্তন ফুটবলারের গড়া 'সেরা ভারতীয় একাদশ', চুরাশির লিগ কতটা প্রত্যাশা মেটাতে পারবে, চুরাশির লিগে কোন দল ফেবারিট এবং প্রিয় খেলোয়াড়দের রঙিন এবং সাদা-কালো ছবি।

বিভিন্ন খেলাধূলায় গত এক বছরে পশ্চিম বাংলা কেমন ফল করেছে এবং রাজ্য সংস্থাগুলি কীভাবে কাজ করছে তার হিসেব নিকেশ।

৬৪ পাতার বই। দাম চার টাকা।

প্রতি সংখ্যায় তিনটি পুরো পাতা রঙিন ছবি ছাড়াও দুই পৃষ্ঠা জুড়ে রঙিন ব্লো-আপ

যেখানে এজেন্ট নেই, সেখানকার আগ্রহীরা আজই লিখুন

শেষবার্তা

নারায়ণচন্দ্র চন্দ

যিশুখ্রিস্টের জন্মের চারশো নব্বই বছর আগে এক শরৎকালের সকালবেলা। এথেন্সের রাজপথ দিয়ে একদল লোক একটি পতাকা ও তিনটি প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলেছে। সামনের লোকটির হাতের পতাকায় নীল জমির ওপর সাদা রঙ দিয়ে লেখা 'মাইলেটাস'। তার পেছনের ব্যক্তির হাতে যে প্ল্যাকার্ড তাতে লেখা 'এথেন্সের বন্ধু'। দ্বিতীয়টিতে লেখা রয়েছে 'গ্রীকদের আত্মীয়', তৃতীয়টির কথা 'বিশেষ বার্তা'। এই শেষ লেখাটির রঙ সাদার ওপর টকটকে লাল। শোভাযাত্রীদের কণ্ঠে কোন ধ্বনি নেই। কী উদ্দেশ্যে এদের আগমন তা কেউ বুঝতে পারল না।

মাইলেটাস থেকে আগত লোকেরা এথেন্সের নগর প্রশাসকের অফিস ঘরের কাছে গিয়ে থামল। দলপতি ঘরে গিয়ে প্রশাসকের সঙ্গে খানিক কি কথা বলল। দলের অন্যদের ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল। খানিক পরেই প্রশাসকের নির্দেশে কয়েকজন ঘোষক শিঙা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল: শিঙা বাজিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগল—এথেন্সের বিপদের বার্তা এসেছে। এখুনি দেবী এথেনীর মন্দির-চত্বরে সমবেত হও, সেখানে সবকিছু বলা হবে।

ঘোষণা শোনার পর নাগরিকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। সবাই মন্দির অভিমুখে ছুটে যেতে লাগল, প্রশ্ন—কী বার্তা এসেছে?

এথেন্স গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র। এখানে সব গুরুতর ব্যাপার প্রকাশ্যে মার্কেট প্লেসে কিংবা মন্দির প্রাঙ্গণে আলোচিত হয়। নাগরিকেরা তাতে অংশগ্রহণ করে।

অল্প সময়ের মধ্যেই চত্বর লোকে পূর্ণ হয়ে গেল। সবাই উৎকণ্ঠিত। নগরের প্রধান ব্যক্তিরা সবাই এসেছেন। ঐ তো নগরপাল, প্রধান সেনাপতি ক্যালিমেকাস, সোফিস্ট ও নাট্যকারেরা। নগরপালের প্রস্তাবে এবং মিলটিয়াডিসের সমর্থনে ক্যালিমেকাস সভা পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। তিনি বললেন—আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র মাইলেটাস থেকে যে বন্ধুরা বার্তা নিয়ে এসেছেন, তাঁদের দলপতি পার্ডিকাসকে আহ্বান করছি। তিনি সবার সামনে আসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করবেন।

সভাস্থল উৎকণ্ঠায় নিথর। মন্দিরের সামনে এক পাথরের বেদীমঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়ালেন পার্ডিকাস। খানিক নীরব থেকে বলতে শুরু করলেন—বন্ধুগণ, আত্মীয়গণ, আজ কোন আনন্দের বার্তা নিয়ে আমরা আসিনি।

গ্রীসের চিরশত্রু পারস্যসম্রাট দরায়ুস ভূমধ্যসাগরের পূবতীরের সব অঞ্চল সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এশিয়া জয় করেই তিনি সন্তুষ্ট নন, ইউরোপ তাঁর চাই এবং ইউরোপ জয় করতে গেলে তাঁর পথের প্রধান কাঁটা গণতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক, সভ্যতার পীঠস্থান, মানুষের কল্যাণকামী রাষ্ট্র এথেন্স।

সভার মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল।

পার্ডিকাস বলতে লাগলেন—এই বিপদের মুখে আমরা আতঙ্কিত, কারণ আমরা জানি, এথেন্স না বাঁচলে আমরা সবাই বিনষ্ট হব। এথেন্স বাঁচলে আমাদের মারে কে? সমগ্র

গ্রীসের ওপর পারস্যের খড়্গ উদ্যত। বিপদের সংকেত একটু আগে জানতে পারলেও যদি আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যেই আমরা ছুটে এসেছি।

সভাস্থল থেকে প্রশ্ন--শত্রুর মারাথন পৌঁছতে কদিন সময় লাগতে পারে?

—খুব বেশি লাগবে না, কারণ তারা অতর্কিত আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে।

পার্ডিকাস নীরব হলেন। সভাপ্রাঙ্গণ নীরব হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। ক্যালিমেকাস উঠে দাঁড়ালেন মঞ্চে। বললেন—

এখন আমাদের সামনে দুটি প্রশ্ন—এক, শত্রুকে প্রতিরোধ করার আয়োজন। আমাদের নিজস্ব শক্তি সংহত করে, কঠোর সংকল্প নিয়ে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এ সংগ্রাম বেঁচে থাকার সংগ্রাম, সন্তান সন্ততি পরিবার পরিজনের জীবন ও সম্মান এর সঙ্গে জড়িত। দুই— আমাদের সৈন্য সংখ্যা মাত্র দশ হাজার। শত্রুর বিশ হাজার সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করে জিততে হলে আমাদের মিত্রদের কাছ থেকে স্থলসৈন্যের দরকার এবং তা চাই অতি শীঘ্র। কে আমাদের এই বিপদে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে পারে? পারে একমাত্র স্পার্টা। তার সৈন্যবাহিনী গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। শত্রুকে সামনে দেখে তারা কখনো পিছোতে জানে না। কিন্তু বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াল সময়। স্পার্টা এখান থেকে বারোশো স্টেডিয়া (১ স্টেডিয়া = ১ ফার্লং। ৮ ফার্লং = ১ মাইল। ১২০০ স্টেডিয়া = ১৫০ মাইল।) দূরে। উঁচু-নিচু পাহাড়ময় পথ। বন প্রান্তর শৈলমালা অতিক্রম করে যেতে হয় সেখানে। কে সেখানে সাহায্যের বার্তা নিয়ে যাবে?

সভার মধ্যে থেকে একসঙ্গে অনেকগুলি হাত শূন্যে উঠল। শোনা গেল—আমি প্রস্তুত; আমি প্রস্তুত: আমি ইচ্ছুক: আমি যেতে চাই।

ক্যালিমেকাস তাদের লক্ষ্য করে বললেন --একে একে পরিচয় দিয়ে বল কত সময় লাগবে ওখানে খবর দিয়ে তাদের মতামত জেনে আসতে?

একজন বলল—আমি হেরাক্লিটাস, সময় নেব ১২ দিন।

এক নাগরিক বলে—এর মধ্যে দরায়ুসের সৈন্য আমাদের বাড়িতে এসে যাবে।

বার্তাবহ হতে ইচ্ছুক অন্য একজন বলে-- আমি ডেলফিডস, সময় নেব ৭ দিন।

একজন বলে---আমি ফাইডিপিডিস।

ফাইডিপিডিস নাম উচ্চারিত হতেই সমবেত লোক করতালি ধ্বনি দিয়ে উঠল। ফাইডিপিডিস ওলিম্পিক বিজেতা গ্রীসের সেরা দৌড়বীর। তার দীর্ঘ আকৃতির ওপর সকলের দৃষ্টি পড়ল।

ক্যালিমেকাস জিজ্ঞেস করলেন--তুমি কদিন সময় নিতে চাও ফাইডি?

ফাইডিপিডিস কয়েক মুহূর্ত নীরবে মনে মনে হিসেব করে নিল, বলল—দেবী এথেনীর আশীর্বাদে ৪ দিনের মধ্যে সংবাদ নিয়ে ফিরে আসব। জনতা উল্লাসধ্বনি করে ফাইডিপিডিসের সাহসকে অভিনন্দিত করল। ক্যালিমেকাস বললেন—যাতায়াতে ২৪শো স্টেডিয়া, সময় ৪ দিন, অর্থাৎ প্রতিদিন ছয়শো স্টেডিয়া অতিক্রম করা। বড়ই কঠিন এ কাজ। ফাইডিপিডিস যদি এই অসাধ্য সাধন করতে পারে, তার নাম গ্রীসের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

ফাইডিপিডিস স্পার্টা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে। পরনে সাঁটা খাটো কোমল ট্রাউজার, গায়ে সাদা হাতকাটা গেঞ্জি ধরনের কোমর পর্যন্ত লম্বা জামা, পায়ে পট্টি ও চপ্পল। বাঁ কাঁধ থেকে আড়াআড়ি একটা চওড়া ফিতা বুকের ওপর কোমর পর্যন্ত এসে পিঠের ওপর দিয়ে ঘুরে গেছে। শাদা ফিতার ওপর সবুজ অক্ষরে লেখা 'এথেন্সের বার্তাবহ'। একটি কাঠের ফলকের ওপর মোমের প্রলেপ, তাতে সরু কাঠি দিয়ে লেখা হয়েছে এথেন্সের প্রতিনিধি অলিম্পিয়ান ফাইডিপিডিসকে স্পার্টার কাছে আবেদন জানাতে পাঠানো হল।

ফলকটি ভূর্জপত্র দিয়ে জড়িয়ে বুকের ওপর ফিতার ভাঁজের মধ্যে রাখা হয়েছে। পথে খাদ্য পাবার সম্ভাবনা কম। পথ গেছে নির্জন পাহাড়ী অঞ্চলের ভেতর দিয়ে, কখনও বা অরণ্যের গা ঘেঁষে। তাই পথে ব্যবহারের জন্য কিছু শুকনো ফল—কিসমিস, ডুমুর, রুটি ও কাঁচা গম বেঁধে দেওয়া হয়েছে পিঠের সঙ্গে। কাঁধের ওপর পাতলা একখানা কম্বল আর পিঠের ওপর কাৎ করে বাঁধা আছে একটি হালকা শক্ত লাঠি। পাহাড়ময় পথে লাঠি তৃতীয় পদের কাজ করে। সর্বশেষে চোখে পড়ে ফাইডিপিডিসের মাথায় জড়ানো একটি সতেজ জলপাই ডাল, তার অলিম্পিক বিজয়ের পুরস্কার-প্রতীক, গ্রীসের সবচেয়ে বড় সম্মানের বস্তু।

স্পার্টার নায়কদের কাছে কি আবেদন জানাতে হবে এথেন্সের কর্তাব্যক্তিরা তা ফাইডিপিডিসকে বুঝিয়ে বলেছেন, কিভাবে সে তৈরি হয়েছে তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে এথেন্সবাসীর শুভেচ্ছায় ও এথেনী দেবীর আশীর্বাদে সফল যাত্রা শেষে সে নিরাপদে ফিরে আসুক—এই কামনা জানিয়ে লোকেরা তাকে বিদায় জানাল।

সেনাপতি ক্যালিমেকাস পাশে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিলেন—যাত্রা কর।

প্রতিযোগিতায় দৌড়ানর সময় ফাইডিপিডিস যেমন স্থৈর্য ও আন্তরিকতার সঙ্গে দৌড় শুরু করত, এখানেও সে তেমনি করল। কেবল দৌড়ের বেগ ছিল মৃদু এবং সমতালের। হাত দুটি আধা ভাঁজ করা, দৌড়ের সঙ্গে তালে তালে তা ওঠা-নামা করতে লাগল।

রাজপথ দিয়ে চলার সময় অনেক যুবক তার সঙ্গে দৌড়িয়ে চলতে লাগল তাকে উৎসাহ দিতে কিন্তু এরা কেউই তো বরাবর পথের সঙ্গী হতে পারবে না।

ফাইডিপিডিস যে দুরূহ ব্রতভার নিজ কাঁধে তুলে নেয় তার পরিণতি দেখার জন্য এথেন্সবাসী অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষারত থাকল। সে যখন যাত্রা শুরু করল তখন অপরাহ্ন। সঙ্গীরা তার সঙ্গে এথেন্সের নগরপ্রাচীর পর্যন্ত গেল। ফাইডিপিডিস নগরদ্বার পার হয়ে একই রকম ভঙ্গিতে, একই গতিতে দৌড়িয়ে চলল। সঙ্গীরা সেখানে দাঁড়িয়ে যতদূর দেখা যায় দৃষ্টিতে তার অনুসরণ করল, পরে সে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলে তারা ফিরে এল শহরের মধ্যে। শুধু তাদের মনের মধ্যে এই দেশপ্রেমিক বীরের কোমল পদক্ষেপ নিঃশব্দে ধ্বনিত হতে লাগল।

ফাইডিপিডিস সমানতালে দৌড়ে চলেছে। বহুদিন দৌড় অভ্যাস করার ফলে নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে হস্তপদ সঞ্চালনের ছন্দোময় গতি তার আয়ত্তে। তাই সহজেই তার দম ফুরিয়ে আসে না। দৌড়ের সময় দেহের শক্তি যথাসম্ভব কম খরচ করা প্রয়োজন, তা

সে জানে। সে জানে, কথা বলতে এমনকি নিজের মনে গুণ গুণ করে গান করলেও কিছুটা শক্তির অপচয় ঘটে যায়। ফাইডিপিডিস তাই নীরবে চলে, তার সঙ্গী দিনে সূর্য, রাতে চাঁদ আর তারকাপুঞ্জ। আর একান্ত সঙ্গী তার মন।

তার মনে পড়ে অলিম্পিকে জয়লাভের পর নানা নগরের সংবর্ধনা নিতে সে এই পথ ধরে গেছে। তখন সঙ্গী ছিল অনেক বন্ধু, আর পরিবেশ ছিল হাল্কা, দায়িত্বহীন আনন্দে ভরপুর। সেই দিনগুলোর কথা চিন্তা করতে তার কাছে পথের রুক্ষতা অনেকখানি কমে যায়।

এথেন্স থেকে যাত্রা করে সে প্রথমে পশ্চিম দিকে চলতে থাকে। সূর্যকে অনুসরণ করে চলেছে সে, সূর্য ক্রমে দিগন্ত রেখার দিকে নেমে যায়। একবার উঁচু টিলাপথের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় সূর্যকে দেখল কোমল সিঁদুর রঙ ধারণ করেছে। তাতে চোখ ধাঁধানো দীপ্তি নেই। খানিকটা উৎরাই নেমেই সে আর সূর্যকে দেখতে পেল না,-দূরের ঐ পাহাড়টার আড়ালে লুকাল।

চলতে চলতে ফাইডিপিডিসের মনে হল, চাঁদের আলো থাকতেই রাত্রিতে বিশ্রামের এক জায়গা খুঁজে নিতে হবে। তখন কিছু খাবার খেয়ে, জল পান করে শরীরটাকে আবার চাঙা করে নেওয়া যাবে। পিপাসা পেয়েছে বেশ, কিন্তু কোথাও জলের ঝরণা দেখতে পায়নি। জল কোথায় পাবে? কিছুটা দূরে পথের ধারে একটা ডালপালা ছড়ানো গাছ নজরে পড়ল। জ্যোৎস্নার আলোকে ঠিক বোঝা গেল না কি গাছ। চাঁদ ডুবে যাওয়ার আগেই ওখানে গিয়ে পৌঁছতে হবে।

গাছের কাছাকাছি যেতে মনে হল জলপাইগাছ। বেশ মোটা, মসৃণ। কাণ্ডের অল্প উঁচু থেকে ডাল বেরিয়েছে। সে গাছে উঠে একটি হেলান ডাল বেছে নিল যেখানে বিশ্রাম নেবার সুবিধা হবে। তার আগে জিভটা ভেজান দরকার। ওপর দিকের একটা পল্লব টানতে হাত বাড়াতে গিয়ে দেখে শাখার মধ্যে দুটি নীলাভ সবুজ চোখ একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ও দুটি পাইথনের চোখ মনে হতেই ফাইডিপিডিসের শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে যেন হঠাৎ একটা শীতল প্রবাহ বয়ে গেল। সে জানে পাইথনের বিষ নেই কিন্তু গলা বুক পেঁচিয়ে ধরলে মানুষের দম বন্ধ করে দিতে পারে। লাঠিখানাকে সে হাতে নেবার চেষ্টা করল। চোখ দুটি একইভাবে অবাক হয়ে দেখছে। ওই চোখের মালিক বোধহয় আগে মানুষ নামক জীব দেখেনি কিংবা এই জনমানবহীন অঞ্চলের গাছে কোন দিন রাত্রিতে কাউকে দেখতে পায়নি। একটু পরেই গাছের অন্য একটি ডাল নড়ে উঠল। চোখের মালিক একটা দোল খেয়ে অন্য ডাল আঁকড়ে ধরল। বাদুড়।

ফাইডিপিডিস একাকীই উচ্চহাসি হেসে উঠল। হাসির শব্দে চকিত বাদুড় দুটি উড়ে গেল ডানা ঝটপট করতে করতে। ফাইডিপিডিস ভাবল—বাদুড় এসেছে যখন, নিশ্চয়ই গাছে পাকা জলপাই আছে। ওতেই পেট ভরবে, জলতৃষ্ণাও দূর হবে।

সে একে একে শাখা বেঁকিয়ে কাছে টেনে অনেকগুলো পাকা জলপাই ছিঁড়ে নিল। বাদুড়ের দেখানো পথেই সে খাদ্য সংগ্রহ করে, গায়ের ওপর কম্বল টেনে দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে বৃক্ষশয্যায় গা এলিয়ে দিল।

লাঠিখানা নিচে পড়ে যাওয়ার শব্দে ফাইডিপিডিসের ঘুম ভাঙলে দেখে তখনও রাত্রি আছে তবে পুবদিক ফরসা হয়ে এসেছে। ঘুমে ক্লান্তি দূর হয়েছে। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে যাত্রা করল। যাবার আগে মনে মনে আশ্রয় ও খাদ্যদাতা গাছকে নমস্কার জানিয়ে গেল।

ফাইডিপিডিস দক্ষিণমুখে চলেছে। স্পার্টার দিকে এগিয়ে চলেছে, এ চিন্তায় উন্মাদনা জাগে।

তার মনে স্থির বিশ্বাস আছে, বীর স্পার্টানরা এ আহ্বানে সাড়া দেবে।

সূর্য যখন মধ্যগগনে ফাইডিপিডিস বিশাল ফটক পার হয়ে স্পার্টায় প্রবেশ করল। মাথায় জলপাইশাখা, বুকের ওপর লেখা 'এথেন্সের বার্তাবহ', পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তরুণেরা অনেকেই তাকে চিনতে পারে, সংবর্ধনা জানায়, কী বার্তা বয়ে এনেছে জানতে চায়। ফাইডিপিডিসকে তারা নগরের প্রধান শাসকের কাছে নিয়ে যায়, তার পরিচর্যা ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে।

কিছুক্ষণ পরে স্পার্টার প্রবীণ নবীন নায়কেরা সভাকক্ষে সমবেত হয়। সেখানে ফাইডিপিডিসের মুখ থেকে বক্তব্য শোনার

জন্য সবাই অধীর। প্রধান নাগরিক এথেন্সের পরিচয় ফলকপত্র পাঠ করে ফাইডিপিডিসকে এথেন্সের বক্তব্য জানাতে বললে সে উঠে দাঁড়ায় সবার সামনে। দুই করতল বুকের ওপর স্থাপন করে, চোখ বন্ধ করে কয়েক মুহূর্ত সে ভিতরের উত্তেজনা শান্ত করার চেষ্টা করে। পরে বলে—

এথেন্স জাতির সঙ্কটকালে যে আবেদন পাঠিয়েছে, বারোশো স্টেডিয়া পথ অতিক্রম করে আমি তা আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করছি। এথেন্সের কণ্ঠস্বর যদি এমন উচ্চ ও তীক্ষ্ণ হত যে, এই পাহাড়পর্বত, প্রান্তর অরণ্যানীর ওপর দিয়ে আপনাদের শ্রুতিগোচর হতে পারত, তবে সেখানকার নরনারীর আকুলকণ্ঠ আপনারা শুনতে পেতেন। এথেন্স আপনাদের গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এবং স্বাধীনতারক্ষক মনে করে। তাই কাছে ভেতরে অন্য কোন রাষ্ট্রের কথা তার মনে আসেনি; স্পার্টার বাহুবল গ্রীসের পরিত্রাণ—এই প্রত্যয়ে এথেন্স অটল।

বন্ধুরাজ্য মারফৎ এথেন্স খবর পেয়েছে পারস্যরাজ দরায়ুসের ছয়শো জাহাজ কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে মারাথন প্রান্তরে অবতরণের জন্য এগিয়ে আসছে। মারাথন থেকে লক্ষ্য এথেন্স। এথেন্স ধ্বংস করা সমগ্র গ্রীস পদানত করার প্রথম পদক্ষেপ। আপনারা বিজ্ঞ, সমরবিদ্যায় অভিজ্ঞ এবং সুদক্ষ। আপনারা ভেবে দেখুন, এথেন্স বিধ্বস্ত করার পর পারস্যের লক্ষ্য কী হবে। এথেন্স তাই চায়, এথেন্সের রক্ষায় এবং এর মাধ্যমে সমগ্র গ্রীস রক্ষায় আপনারা অবিলম্বে সাহায্যে এগিয়ে আসুন। গত পরশু ৭ সেপ্টেম্বর এথেন্স এই খবর পেয়েছে। সেই দিনই অপরাহ্নে যাত্রা করে আজ ৯ই আপনাদের সামনে জরুরি বার্তা নিবেদন করা হল। আপনাদের অভিমত নিয়ে এখুনি স্বদেশ অভিমুখে ফিরতে হবে। কারণ এথেন্স আপনাদের মুখ চেয়ে রয়েছে। আপনারা জানেন, ব্যাকুল প্রতীক্ষাকালে প্রতিটি মুহূর্ত হয় দীর্ঘ এবং পীড়াদায়ক।

ফাইডিপিডিস থামলে সভা খানিকক্ষণ নীরব হয়ে রইল। প্রবীণেরা নিজেদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা বলে নিয়ে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—

এথেন্সের আবেদনে আমরা সর্বান্তঃকরণে সাড়া দেব। কারণ এ বিপদ একা এথেন্সের নয়, সারা গ্রীসের। তবে এই মুহূর্তে আমরা যাত্রা করতে পারছিনে। আজ শুক্লা নবমী। আমাদের একটি উৎসবের অঙ্গ হিসেবে পূর্ণিমা পর্যন্ত নগর ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া চন্দ্রের কলা পূর্ণ হওয়া যাত্রায় পরিপূর্ণ সাফল্যের দ্যোতক বলে আমরা মনে করি। আজ থেকে পাঁচদিন পরে আমাদের দুই হাজার সৈন্য মারাথন উদ্দেশ্যে রওনা হবে। এথেন্সের কাছে স্পার্টার এই আশ্বাসবাণী বহন করে নিয়ে যাও বীর বার্তাবহ। যোগাযোগকারীরূপে তোমার অদ্ভুত কৃতিত্ব সফল হোক এবং আমাদের তরুণদের অনুপ্রাণিত করুক।

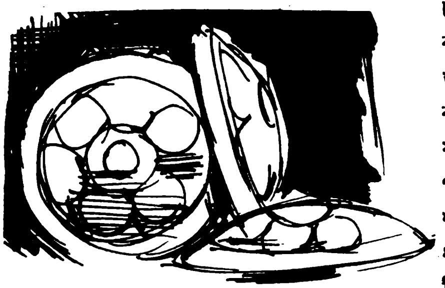

হাল্কা মনে ফাইডিপিডিস স্পার্টা থেকে এথেন্স অভিমুখে রওনা হল। তার শ্রম সার্থক হয়েছে। বিদায় নেবার সময় সে স্পার্টার নায়ক ও তরুণদের তার দেশের শ্রদ্ধা ও আস্থার কথা জানিয়ে এসেছে। তার মনে কেবল একটা প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে-- পূর্ণিমার আগের পাঁচদিন আর স্পার্টান সৈন্যদের এথেন্সে উপস্থিত হতে যে কয়দিন লাগবে তারই মধ্যে কিছু অঘটন ঘটে না যায়! স্পার্টার সাহায্য পৌঁছানর আগেই যদি পারসিক সৈন্য মারাথনে নামে এবং সেখান থেকে এথেন্সের দিকে এগিয়ে আসে তবে এথেনীয়রা তাদের ঠেকাতে পারবে তো? এ চিন্তা তার মনের আনাচে-কানাচে থাকলেও তার দেশের মানুষের ওপর যে গভীর বিশ্বাস আছে তাতে সে জানে স্বাধীনতার পূজারীদের সামনে বিদেশী লোভী মানুষ দাঁড়াতে পারবে না।

মানুষের কাছে চেনা পথের দূরত্ব কম। তার ওপর মনের ভার কম থাকলে পথ আরো সুগম বোধ হয়। ফেরার পথ ফাইডিপিডিসের কাছে কষ্টকর মনে হচ্ছে না। মন আগে আগে চলে গেছে এথেন্সে, সে কেবল মনের আধারটিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে ফেরার দ্বিতীয় রাত্রির ঘটনা তার কাছে দেবতার এক ইঙ্গিত বলে মনে হল।

রাত্রিতে অধিকক্ষণ জ্যোৎস্নালোক পাওয়া যাচ্ছে তাই স্বপ্নলোকের ভিতর দিয়ে চলার অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হচ্ছে। রাত্রিতে চাঁদ তখনো পশ্চিম আকাশে। একটা বনের পাশ দিয়ে চলেছে, তবে বনটি অনেকটা নিচে পাহাড়ের ঢালে। সামনে একটু ছোট টিলার ওপর কয়েকটা গাছ, ওকগাছ হবে। ফাইডিপিডিস ভাবল ওখানে গিয়ে খানিক বিশ্রাম করে নেবে। গাছের কাছে গিয়ে দেখে কাণ্ডটা অনেকখানি সরল, ডালপালা বেরিয়েছে উঁচু থেকে। গাছে না উঠে তার গোড়াতেই একটু পরিষ্কার করে নিয়ে কাণ্ডে ঠেস দিয়ে, পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। অল্প সময়ের মধ্যে তন্দ্রার ভাব এসেছে। হঠাৎ অনেকগুলো পাখির আর্ত চিৎকার আর ডানার ঝটপটানিতে সে জেগে উঠল। ওপর দিকে চেয়ে দেখে পাখিগুলো টিঁয়া-টিঁয়া—ট্যা-ট্যা করতে করতে ছুটে এদিকে ওদিকে উড়ে পালাচ্ছে। চাঁদের আলোকে পাখিদের পালকের রঙ বুঝতে পারল না, লম্বা সরু লেজ আর ডাক শুনে বুঝল, টিয়া। ওরা গাছে একত্রে রাত্রিবাস করছিল। কিন্তু হঠাৎ কী বিপদ ঘটল যার জন্যে ওদের পালাতে হচ্ছে? এমন সময় গাছের ওপর থেকে মুমূর্ষু পাখির অস্ফুট শব্দ। ডানার আস্ফালন আর পেঁচার হর্ষধ্বনি। নিশাচর পেচক টিয়াদের আস্তানায় নিঃশব্দে হানা দিয়ে একটিকে অতর্কিতে নখে বিঁধে বন্দী করেছে। তারপর তার কোমল মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভক্ষণ আর তৃপ্তি প্রকাশক শব্দ হু-হু-হু। ফাইডিপিডিস শিকারী ও তার শিকারকে দেখার চেষ্টা করল কিন্তু স্পষ্ট নজরে পড়ল না। অল্পক্ষণ পরেই একটা বড় পেঁচা পায়ে একটা মৃত পাখি ঝুলিয়ে ঐ নিচের বনের দিকে উড়ে গেল।

ফাইডিপিডিস আর ঘুমের চেষ্টা করল না। তৈরি হয়ে স্বদেশ অভিমুখে রওনা হতে হবে। গাছের তলায় কতকগুলো সবুজ-নীল কোমল পালক ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েকটি পালক সে তুলে নিল, তাতে রক্তের ফোঁটা দেখাচ্ছে গাঢ় লাল শিশিরবিন্দুর মত। পালকটি সযত্নে হাতে নিয়ে সে চলতে শুরু করল।

পেচকের শিকার ধরার দৃশ্যটি চিন্তা করতে করতে হঠাৎ মনে একটা কথা ঝিলিক দিয়ে উঠল—এটা কি দেবতার ইঙ্গিতবহ কোন দৈব ঘটনা? পেচক এথেন্সের রক্ষয়িত্রী দেবী এথেনীর বাহন। পেচকের টিয়া নিধন কি কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস? তার মনে পড়ে—ট্রয়যুদ্ধকালে দেবতাদের কাছ থেকে অনেক অর্থবহ ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। যাই হোক, কল্পনার ওপর আশার আলো পড়লে তা সুখকর হয়ে ওঠে।

*

১১ তারিখ ফাইডিপিডিস যখন এথেন্স নগরে প্রবেশ করল তখন সৈনিকেরা যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত। সেনাপতিরা কেবল স্পার্টার সিদ্ধান্ত জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন,—যাতে যুদ্ধের কৌশল চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা যায়। এটা আগেই স্থির হয়েছিল, স্পার্টার জন্য অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করা উচিত হবে না। তাতে শত্রু বিনাবাধায় অবতরণ করে

এথেন্সের দিকে এগিয়ে আসার সুযোগ পাবে।

ফাইডিপিডিসের মুখে স্পার্টার সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে সেনাপতিরা সেইদিনই মারাথন অভিমুখে যাত্রা করলেন। প্রধান সেনাপতির দায়িত্বে ক্যালিমেকাস, তাঁর সহকারী সেনাপতি দশজন। ঠিক হল, দরকার হলে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা বুঝে তাঁরা স্পার্টানদের জন্য অপেক্ষা করবেন।

*

এথেনীয় বাহিনী চলার পথে খবর পায়, পারসিক সৈন্য সাগরকূলে মারাথন প্রান্তরে অবতরণ করেছে। ক্যালিমেকাস দ্রুত গতিপথ পরিবর্তন করে মারাথন প্রান্তরের পশ্চিমদিকে উঁচু আঙলোনা উপত্যকা অধিকার করলেন। সেখান থেকে শত্রু সৈন্যের অবস্থান স্পষ্ট চোখে পড়ে। সামনে সবুজ সমভূমিতে সারি সারি সাদা শিবির, তার ওপাশে গাঢ় নীল সাগরজলে মাস্তুলে সাদা পাল জড়ানো কয়েকশো নোঙর-করা জাহাজ। শত্রু সৈন্যের মধ্যে আক্রমণের তোড়জোড় দেখা যায় না, হয়ত কোন পরিকল্পনা নিয়ে অপেক্ষারত। এথেন্সের বাহিনীও তার ওপর নজর রেখে প্রতীক্ষা করছে। যদি ইতিমধ্যে স্পার্টান বাহিনী এসে পড়ে, ভালই। এইভাবে একে একে আটদিন দুই দল পরস্পরের সামনে বসে রইল। ফাইডিপিডিস এথেন্সে ফিরে মারাথনে এসে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে। তার কাজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রধান সেনাপতির নির্দেশ দৌড়ে অন্যান্য নায়কদের কাছে পৌঁছে দেওয়া, তাদের বক্তব্য প্রধানকে এসে জানান। রণাঙ্গনের যোগসূত্র সে।

নবম দিন, ২১ সেপ্টেম্বর। পারসিক সৈন্যদের চলাচল করতে দেখা গেল। গোপন সংবাদ পাওয়া গেছে, কতক সৈন্য ওখানে থাকবে, কতক জাহাজে এথেন্সের কাছাকাছি গিয়ে নগরের ওপর আক্রমণ হানার পরিকল্পনা হয়েছে। মিলটিয়াডিসের নেতৃত্বে এথেনীয় বাহিনী মরণপণ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। গ্রীক ইতিহাসে এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের প্রথম সংঘর্ষ। সৈন্য সমাবেশের কৌশলে এথেনীয়রা পারসিকদের চক্রব্যূহের মধ্যে ফিরে জালে আবদ্ধ বন্যপ্রাণীর মত কচুকাটা করে ফেলল। বেগতিক দেখে কতক জাহাজ ফেলে তারা অপর জাহাজগুলোতে গিয়ে আশ্রয় নিল। তাদের নিহতের সংখ্যা হল ৬,৪০০। এথেন্সের পক্ষে প্রাণ হারাল বীর ক্যালিমেকাস সহ ১৯২ জন।

*

এথেন্সের এই জয় আশাতীত, অপ্রত্যাশিত। ওদিকে অরক্ষিত এথেন্স নগর দিনের পর দিন রাতের পর রাত যুদ্ধের খবরের পথ চেয়ে রয়েছে। সেখানে এই বিজয়বার্তা পৌঁছে দিয়ে নগরবাসীদের উৎকণ্ঠা দূর করতে হবে। সারাদিনের যুদ্ধে পরিশ্রমের পর কে নিয়ে যাবে এই বার্তা?

গ্রীক সৈন্যগণ উল্লাসে মত্ত হয়ে শত্রু সৈন্যের অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। ফাইডিপিডিস হাস্যমুখে মিলটিয়াডিসের সামনে এসে অভিবাদন করল, বলল—সেনাপতি, আমি প্রস্তুত।

মিলটিয়াডিস তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে বললেন—ফাইডিপিডিস, স্পার্টায় যাতায়াতের অমানুষিক পরিশ্রম ও কষ্টের পর তোমার বেশ কিছুদিন পূর্ণ বিশ্রাম দরকার ছিল। কিন্তু তা দেওয়া সম্ভব হয়নি। আজ তো সারাদিন তোমায় ছুটাছুটি করতে হয়েছে যুদ্ধপ্রান্তরে। কাজেই এ কাজটি বরং অন্যকেই দিই? কি বল?

ফাইডিপিডিস বিনয়ের সঙ্গে বলে—এই দায়িত্বটি আমি জীবনের সবচেয়ে গৌরবের বলে মনে করব।

মিলটিয়াডিস একটি জলপাইশাখার মালা তার মাথায় পরিয়ে দিয়ে হাস্যোজ্জ্বল চোখে জিজ্ঞেস করেন—এর চাইতেও?

'নিশ্চয়ই' বলে ফাইডিপিডিস মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সেনাপতি বলেন—সত্যি, এ গৌরব তোমারই প্রাপ্য। কেবল তোমার দেহের কষ্টের কথা ভেবেই অন্যের খোঁজ করেছিলাম। বেশ, তুমি এগিয়ে যাও, আমরা পরে আসছি।

ফাইডিপিডিস হাত তুলে সকলকে অভিবাদন জানিয়ে এথেন্স অভিমুখে ছুটতে শুরু করে। খুব বেশি সময় নেই, সূর্যাস্তের আগেই পৌঁছতে হবে, নইলে নগরদ্বার খোলা পাওয়া যাবে না।

*

ফাইডিপিডিসের মন এবার আনন্দে, উত্তেজনায় কানায় কানায় পূর্ণ। স্পার্টার সাহায্য আসার আগেই এথেন্স নিজ বাহুবলে বিজয়ী হয়েছে। তার মনে পড়ে পেচকের টিয়া শিকার দৃশ্যটি। সে ছুটে চলেছে উঁচু-নিচু পথে। ক্রমে তার গতির বেগ কমে আসে, সে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। তবু আধা-দৌড়, আধা-হাঁটা, পরে কেবল হাঁটা—এই ভাবে এগোতে থাকে কিন্তু তার পা আর উঠতে চায় না। সে এতখানি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল নিজে তা বুঝতে পারেনি। সেনাপতি সত্যিই অনুমান করেছিলেন তার পক্ষে এই ২৬ মাইল পথ অতিক্রম করা দারুণ কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে। ক্রমশ তার কষ্ট বাড়তে লাগল। হাত পা কাঁপছে, বুকের মধ্যে যে তোলপাড় হচ্ছে বাইরে তার শব্দ শোনা যায়। মুখ দিয়ে বাতাস টেনে নিয়েও দম পাওয়া যায় না। চলতে চলতে কয়েকবার পথের পাশের পাথর ধরে দাঁড়িয়ে পাথরের ওপর মাথা রেখে একটু শক্তি ফিরে পেতে চেষ্টা করে। কিন্তু মনে হচ্ছে আর চলা যাবে না। সামনে চেয়ে ওই অদূরে এথেন্সের শ্বেতস্তম্ভ দেখা যায়। ওইটি তার স্বর্গভূমি, ওখানে যেতেই হবে। খানিকটা চলে, আবার দাঁড়ায়। এথেন্সের প্রাচীরের ওপর বালক-বালিকা আর নারীদের দেখা যায়। তারা সংবাদের আশায় পথ চেয়ে আছে। তারা ফাইডিপিডিসকে দেখতে পেয়েছে কিন্তু বুঝতে পারেনি লোকটি কে, কি খবর নিয়ে আসছে, জয়ের না পরাজয়ের। তার চলার ভঙ্গি দেখে ওদের মনে হয়েছে, নিশ্চয়ই কোন হৃদয়বিদারক সংবাদ তাই বার্তাবহ দুঃখে ভেঙে পড়েছে।

কয়েকজন নারী প্রাচীর থেকে নেমে দৌড়ে আসে ফাইডিপিডিসের কাছে। তাকে সবাই চেনে। সাগ্রহে প্রশ্ন করে—কী খবর ফাইডিপিডিস? যুদ্ধের কি খবর?

তাকে ওরা হাত ধরে তোলে, তার চোখের দিকে চায়। সর্বাঙ্গে ক্লান্তি ও অবসন্নতা পাণ্ডুর ছায়া ফেলেছে কিন্তু চোখের তারায় এক কণা স্নিগ্ধ আলো। কয়েকবার দম নিয়ে একটি হাত সামান্য উঁচু করে তুলে বলে—আ ন ন্দ ক র...আ ম রা বি জ য়ী...

শেষ কথাটি অতি কষ্টে অস্ফুট উচ্চারণ করেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। সতেজ জলপাইশাখাটি তখনও তার মাথায়, তার চোখের কোলে একবিন্দু আনন্দের অশ্রু, তার প্রাণ নিঙড়ানো মুক্তাফল॥

● ফাইডিপিডিস মারাথন থেকে এথেন্স ২৬ মাইল দৌড়ে জয়ের খবর নিয়ে এসেছিল। এই দৌড়ের স্মারকরূপে পরবর্তীকালে অলিম্পিক খেলায় ২৬ মাইল মারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার প্রবর্তন।

● মারাথন যুদ্ধের দিনই স্পার্টার সহায়ক সেনাদল এসে পৌঁছে। ততক্ষণে যুদ্ধ শেষ। স্পার্টানরা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে নিহত পারসিক সৈন্যদের দেখে আসে।

ছবি : সোমাশিস

কিশোর মনের প্রাঙ্গণে

কিশোর জীবনের অনেক সমস্যা—অনেক বেদনা। এসব কথা নিয়ে আমাদের চিন্তা-ভাবনা বিনিময়ের স্থান হবে এই প্রাঙ্গণ। এ বিষয়ে আমরা এখানে নিজস্ব মতামত পেশ করব। প্রয়োজনে অভিভাবকদের মতও শোনাব। এ পাতা সম্পাদকীয় বা চিঠিপত্রের পাতা থেকে স্বতন্ত্র। খেলার মাঠে আমাদের যে খুশি, যে আনন্দের প্রকাশ—এ প্রাঙ্গণেও তাই।

এক একটি সমস্যা নিয়ে আমাদের মত মতান্তর একাধিক সংখ্যাতেও চলতে পারে। আমরা প্রতি সংখ্যার জন্য প্রাপ্ত চিঠিগুলির থেকে নির্বাচন করে কয়েকটি চিঠি এ পাতায় প্রকাশ করব। সেরা তিনটি চিঠির লেখক-লেখিকাকে আমরা পনের টাকা করে পুরস্কারও দেব।

চিঠি লিখবার সময় খামের ওপরে 'কিশোর মনের প্রাঙ্গণে' কথাটা লিখতেই হবে। ঠিকানা তার তলায়। চিঠি স্পষ্টাক্ষরে কাগজের এক পিঠে লিখতে হবে। চিঠি সাধারণভাবে পাঁচশ শব্দের মধ্যে হওয়া দরকার। চিঠি শুধু আবেগে উজ্জ্বল হলে চলবে না—যুক্তি চাই। সঙ্গে নিচের কুপনটি থাকা চাই।

সর্বস্তরের লোকেরাই অংশগ্রহণ করতে পারেন। তবে তাঁদের লেখা সেরা হলেও পুরস্কার দেওয়া হবে না।

আমাদের দেশে কিশোরদের শিশুত্ব কখনও ঘোচে না

মাননীয় সম্পাদক, 'কিশোর মন'

'কিশোর মন'-এর প্রথম সংখ্যায় আপনারা 'এ যুগের কিশোরেরা উচ্ছৃঙ্খল' —এই সময়োপযোগী বিতর্কের সূচনা করেছেন বলে ধন্যবাদ জানাই। আসলে কিশোরদের সম্পর্কে বর্তমান সময়ে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে উচ্ছৃঙ্খলতার অভিযোগ। কিন্তু সত্যিই কি কিশোরেরা দুর্বিনীত?

বড়রা সহজাত স্নেহ ও ভালবাসার চোখে কিশোরদের দেখেন, বিচার করেন। কিশোরের কাছ থেকে শিশুর মত আচরণ পেলেন না বলেই কি কিশোরেরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেল?

যাঁরা বলছেন কিশোরেরা উচ্ছৃঙ্খল, তাঁরা যদি একটু খোলা চোখে দেখেন, তাহলে তাঁরা দেখতে পাবেন আজও কিশোরেরা স্বাধীনতার দিন কৌটোয় পয়সা সংগ্রহ করে দরিদ্র ছেলেমেয়েদের বই কেনার ব্যবস্থা করছে, দশ পয়সার বা পঁচিশ পয়সার কুপন বিক্রী করে হাসপাতালে রোগীদের ফল বিতরণ করছে। আজও বন্যার্ত এলাকায় বা দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকায় কিশোরেরাই তাদের যৎসামান্য সাহায্যের আয়োজন নিয়ে হাজির হচ্ছে সকলের আগেই।

আচারে-আচরণে, পোশাকে, সৌজন্যে কোথাও কিন্তু কিশোরেরা একটুও চ্যুত হয়নি। আর যদি কোন কোন বয়স্ক মানুষ সত্যিই দাবী করেন যে এখনকার কিশোরেরা কি পোশাকে, কি ব্যবহারে কি সৌজন্যে—বড় বেশি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে —তাহলে বলব সেই সব কিশোরদের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে দায়ী তাদের বয়স্ক অভিভাবকরাই।

সবশেষে বলি আমাদের দেশে বড়রা কখনই কিশোরদের কিশোর বলে ভাবতে পারেন না। তাঁরা ভাবেন কিশোরেরা আসলে শিশুই। ওরা এমন পাকা পাকা কথা বলবে কেন? ফলে বয়স্কদের মানসিকতায় বাধছে যত সংঘাত। আসলে আমাদের দেশে কিশোরদের শিশুত্ব কখনও ঘোচে না।

চন্দন রায়
দশম শ্রেণী, বয়স-১৬,
ছান্দারা হাই স্কুল, হুগলী

সবাই খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখেছেন'

মাননীয় সম্পাদক
'কিশোর মন'

সম্প্রতি প্রকাশিত 'কিশোর মন' (১৬.৪.৮৪)-এর পাতায় কিশোরদের বিরুদ্ধেই একটি অভিযোগ দেখলাম।

কিশোরদের বিরুদ্ধে উচ্ছৃঙ্খলতার অভিযোগ নতুন নয়। বেশ কিছুদিন আগে ক্লাসে এক মাস্টারমশাই বলেছিলেন, মিশরের এক জায়গায় মাটি খুঁড়ে একটা পাথর পাওয়া গিয়েছিল। তার গায়ে খোদাই করে কিশোরদের বিষয়ে যা লেখা ছিল তার সারমর্ম হল—এখনকার কিশোরেরা দিন দিন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে, তাদের মধ্যে বিনয়-নম্র ভাব ক্রমেই যেন কমে আসছে। পণ্ডিতরা বলছেন পাথরের গায়ের ঐ লেখার বয়স অন্তত তিন হাজার বছর। অর্থাৎ আমার বক্তব্য এই যে যুগে যুগে কিশোরদের এ ধরনের অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রত্যেক যুগেই বয়স্করা তাঁদের সময়ের কিশোরদের উচ্ছৃঙ্খল ভেবেছেন। কিন্তু কিশোররা কি সত্যিই উচ্ছৃঙ্খল?

কিশোর মনের পাতায় অনেকের অভিমত দেখলাম। কিন্তু আমার মনে হয় সবাই খণ্ডিত দৃষ্টি নিয়ে বিষয়টি বিচার করেছেন। তাঁদের একজনের বক্তব্য কিশোরদের মধ্যে ভালর সংখ্যা নগণ্য। আমি বলব, যে সব গর্হিত কাজের দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন সেগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমন কিশোরের সংখ্যাই গোঁটে গোনা যায়। আজও যেকোন ভাল কাজে কিশোররাই সর্বপ্রথম উদ্দীপ্ত হয়।

আজকের কিশোরদের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সচেতনতা কিন্তু আগের দিনের থেকে অনেক বেশি। গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-মাঠে আজও অনেক কিশোর তাদের দুঃস্থ সংসারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিচ্ছে। আজও অনেক কিশোর আছে যারা গ্রামের পথ তৈরির জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজে নামছে বড়দের সঙ্গে, প্রাথমিক হাসপাতাল তৈরির জন্য চাঁদা তুলছে। এগুলো কি বড়দের চোখে পড়ে না?

সবশেষে, বয়স্কদের উদ্দেশে সবিনয়ে বলতে চাই, কোনও মতামত প্রকাশের আগে সব দিকটা দেখুন, আশেপাশের দৃষ্টান্তই সব নয়। সেটাই সমস্ত কিশোর-সমাজের পরিচয় নয়। বিনীত—

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়
বয়স-১৫, নবম শ্রেণী, পাঠভবন,
শ্রীনিকেতন,

কিশোর মনের প্রাঙ্গনে

নাম ____________________

ঠিকানা ____________________

____

বয়স __________ শ্রেণী __________

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ____________________

____

____

স্বাক্ষর ____________________

বিচিত্র সংবাদ

রাখে হরি মারে কে !

বিশ্ব ক্রীড়া জগতে আমেরিকার লুই জামপিরিনি ছিলেন উড়ন্ত মানুষ। লোকে বলত 'দৌড়বাজ'। কিন্তু এই দৌড়বীর জামপিরিনি আরও বেশি বিখ্যাত সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার জন্য। খুব ছোট বয়সেই পিছলে পড়ে গিয়ে তাঁর কোমরের হাড় ভাঙে। তারপর কিশোর বয়সে দুবার চোট খান হাঁটুতে। যৌবনের মুখে হঠাৎই পড়ে গিয়ে গোড়ালির হাড় ভাঙেন। এরপর কারখানায় কাজ করতে গিয়ে আচমকা মেসিনের মধ্যে পা ঢুকে যাওয়ায় হারান পাঁচ পাঁচটি আঙুল। কিন্তু খেলার আসর থেকে অবসর নেওয়ার কথা মনেই এল না তাঁর। আবার ফিরে এলেন মাঠে। ১৯৩৬ সালে ওলিম্পিকে জায়গা করে নিলেন। এখানেই হিটলারের বিরোধিতা করায় রক্ষীদের হাতে এমন মার খেলেন যে হাসপাতালে শয্যা নিতে হল তাঁকে। সেবারও বেঁচে উঠলেন এবং দেশে ফিরে মাঠে নেমেই গড়লেন দৌড়ের

মার্কিন রেকর্ড। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। জামপিরিনি বিমান-বাহিনীতে যোগ দিলেন এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই পড়লেন বিমান দুর্ঘটনায়। বিমানটি পড়ল প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে। কিন্তু জামপিরিনি তখনও অক্ষত। ৪৭ দিন ধরে লাইফবোট সম্বল করে ভেসে বেড়ালেন সমুদ্রের লোনা জলের বুকে। অবশেষে একটি জাপানী রক্ষীনৌকা তাঁকে উদ্ধার করে। যেহেতু তিনি শত্রুবাহিনীর লোক সেহেতু সেখানেও দীর্ঘদিন ধরে তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালান হল। যুদ্ধশেষে স্বদেশে ফিরে এলেন জামপিরিনি। তখন তাঁর ওজন দাঁড়িয়েছে মাত্র ৭৭ পাউণ্ড। একেই বোধহয় বলে 'রাখে হরি মারে কে !'

রাতারাতি মোটা

রাতে শোয়ার সময় চেহারাটা ছিল হাড়গিলে, রোগাপটকা, আর সকালে

উঠেই যদি দেখে চেহারাটা হয়ে গেছে ভীমের মত দশাসই, তাহলে ভিরমি না খেয়ে উপায় কি! ঠিক এরকমটি না হলেও, খুব অল্পদিনের মধ্যে অসম্ভবরকম মোটা হওয়ার একটি ঘটনা ঘটেছিল আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যে। ওই রাজ্যেরই রেসিগ অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন আর্থার নোর। ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে আর্থারের ওজন ছিল ২৭২ কেজি.। সাধারণ মানুষের তুলনায় মোটাই বটে। কিন্তু ওই বছরই জুলাই মাসে হঠাৎ তাঁর ওজন বেড়ে গেল ১৩৬ কেজি.। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ভদ্রলোকের ওজন দাঁড়াল ৪০৮ কেজি.। আর হঠাৎই মোটা হওয়ার চোটে কিনা কে জানে, ওই জুলাই মাসেই আর্থার নোর-এর মৃত্যু হল।

মোটা হওয়ার এমনই আরেকটি চমকপ্রদ খবর জুগিয়েছিলেন সানফ্রান্সিসকো শহরের মিস ডরিস জেমস। ১৯৬৫ সালে মাত্র ৩৮ বছর বয়সে তিনি মারা যান। তখন তাঁর শরীরের ওজন ছিল ৩০৬ কেজি.। অথচ মাত্র এক বছর আগে ১৯৬৪ সালে মিস জেমসের ওজন ছিল মাত্র ১৫৯ কেজি.। অর্থাৎ এক বছরে তাঁর ওজন বেড়েছিল ১৪৭ কেজি.।

মরাল-গ্রীবার লোভে

হাঁসের মত লম্বা গলা নাকি নারী দেহের সৌন্দর্যের নিদর্শন। অন্তত ব্রহ্মদেশ বা বর্মার 'কারেন' উপজাতিরা তাই

বিশ্বাস করে। ওখানকার সমাজে কোন মেয়ের জন্মগ্রহণের পরই তার গলায় পরিয়ে দেওয়া হয় একটা তামার স্প্রিং। মেয়েরা বড় হলেও তার গলা থেকে ওই স্প্রিংটি খোলা হয় না। স্প্রিংয়ের চাপে মেয়েদের গলা পূর্ণ বয়সে ১৫ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়ে যায়। ভাববার কথা যে ওই স্প্রিংয়ের চাপ মেয়েরা সহ্য করে কেমন করে। আসলে দীর্ঘ সময়ের অভ্যাসের ফলেই বুঝি ওই চাপ তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। আর খোলারও তো উপায় নেই। যদি ঘাড় মটকে যায় !

হাঁচতে হাঁচতে বিশ্ব রেকর্ড

বিশ্ব রেকর্ড করার জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই। খেলার মাঠ থেকে শুরু করে মেয়েদের হেঁসেল ঘর অবধি বিশ্ব রেকর্ডের ছড়াছড়ি। কিন্তু হাঁচি আর হেঁচকি? তারও কি বিশ্ব রেকর্ড হয় নাকি? হয় বৈকি। সেই জন্যই তো বিশ্ব রেকর্ডের পাতায় নাম লেখা হয়েছে জুন ক্লার্ক আর চার্লস অসবোর্নের মত নারী পুরুষদের।

চার্লস অসবোর্ন আমেরিকার আইওয়া

রাজ্যের অ্যান্থন শহরের বাসিন্দা ছিলেন। ২৮ বছর বয়সে একটা শুয়োর কাটতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর গা-টা কেমন গুলিয়ে ওঠে। আর তারপরই হেঁচকি ওঠা শুরু হয়। কেউ তাঁর মাথায় জল দেয়, কেউবা ছোটে বদ্যি ডাকতে। কিন্তু হেঁচকি আর কিছুতেই থামে না। ঘটনার শুরু ১৯২২ সালে। অসবোর্ন সাহেব এখনও বেঁচে আছেন কিনা কে জানে, তবে আজ থেকে পাঁচ বছর আগের খবর, বেচারা অসবোর্ন সাহেব নাকি তখনও হেঁচকি তুলে চলেছিলেন।

অনবরত হাঁচির বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন আমেরিকারই ফ্লোরিডা রাজ্যের যুবতী জুন ক্লার্ক। ১৯৬৬ সালের ৪ জানুয়ারি থেকে ৭ জুন পর্যন্ত জুন একনাগাড়ে হেঁচে চলেছিলেন। অবশেষে বৈদ্যুতিক শক খেয়ে বেচারীর হাঁচি বন্ধ হয়।

সংকলন : বর্ণচোরা রায়

গায়েব, আজ থেকে তোমার নাম হবে শিলাদিত্য। তোমার রাজবংশ হবে সূর্যবংশ।
আমরা আপনাকে সম্রাট বলে স্বীকার করলাম।
ওদের মুক্ত করে দাও। আপনারা স্বরাজ্যে ফিরে যান। আজ থেকে আপনারা আমার করদ-মিত্র।
সম্রাট শিলাদিত্যের জয় হোক।
শিলাদিত্য মহা ধুমধামের সঙ্গে বিবাহ করলেন।
সম্রাট! আপনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করুন।

রানীর মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে শিলাদিত্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন।
মন্দির! হ্যাঁ, মন্দির না হয় প্রতিষ্ঠা করব। কিন্তু গায়েবী?... আমার বোন?... কত দিন তার সংবাদ পাইনি....
গায়েবীর কথা মনে হতেই সব ফেলে শিলাদিত্য তাঁর ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বসলেন। গাড়ি ছুটে চলল গায়েবীর উদ্দেশ্যে সূর্য-মন্দিরের দিকে। সূর্য-মন্দিরে পৌঁছে দেখলেন, চারদিকে দুর্ভেদ্য গাছপালা। যাবার পথ পর্যন্ত অবরুদ্ধ। তিনি আদেশ দিলেন-
গাছ কাট! কেটে ফেলে পথ কর।

এরপর ৬২ পৃষ্ঠায়

গ্রাম বাঙলার লোককথা

সোজাপথ বাঁকাপথ

রফিকুল ইসলাম

এক দেশের মাঠে এক রাখাল প্রতিদিন গরু চরাত। একদিন রাখাল গরুগুলোকে মাঠে ছেড়ে দিয়ে রাস্তার মাঝখানে বসে বসে গর্ত খুঁড়ছে,—এমন সময় ঐ দেশের রাজার মন্ত্রী ঘোড়ায় চড়ে সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। গর্ত খোঁড়া দেখে মন্ত্রী ঘোড়া থামিয়ে রাখালকে বললে, আচ্ছা ছেলে তো তুই? রাস্তার মাঝখানে গর্ত করছিস। লোকে গর্তে পড়ে যাবে না?

মন্ত্রীর কথায় রাখাল গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তেই বললে, গর্তে পড়বে কেন? লোকে কি গর্তটা দেখতে পাবে না?

মন্ত্রী বললে, যদি গর্তটা দেখতেই পায়, লোককে অনেকটা ঘুরে বেঁকে তো যেতে হবে। নইলে গর্তে পড়বেই।

রাখাল হেসে বললে, সোজাপথে গেলে কেউ পড়ে না, বাঁকাপথে গেলেই পড়ে যায়।

রাখালের কথাবার্তা শুনে মন্ত্রী মনে মনে ভাবলে—ছেলেটা তো বেশ কথা বলতে পারে!

মন্ত্রীর সাথে রাখালের আরও কিছু কথাবার্তা হল। মন্ত্রী বুঝতে পারলে ছেলেটা রাখাল হলেও বুদ্ধি-সুদ্ধি বেশ ভালই।

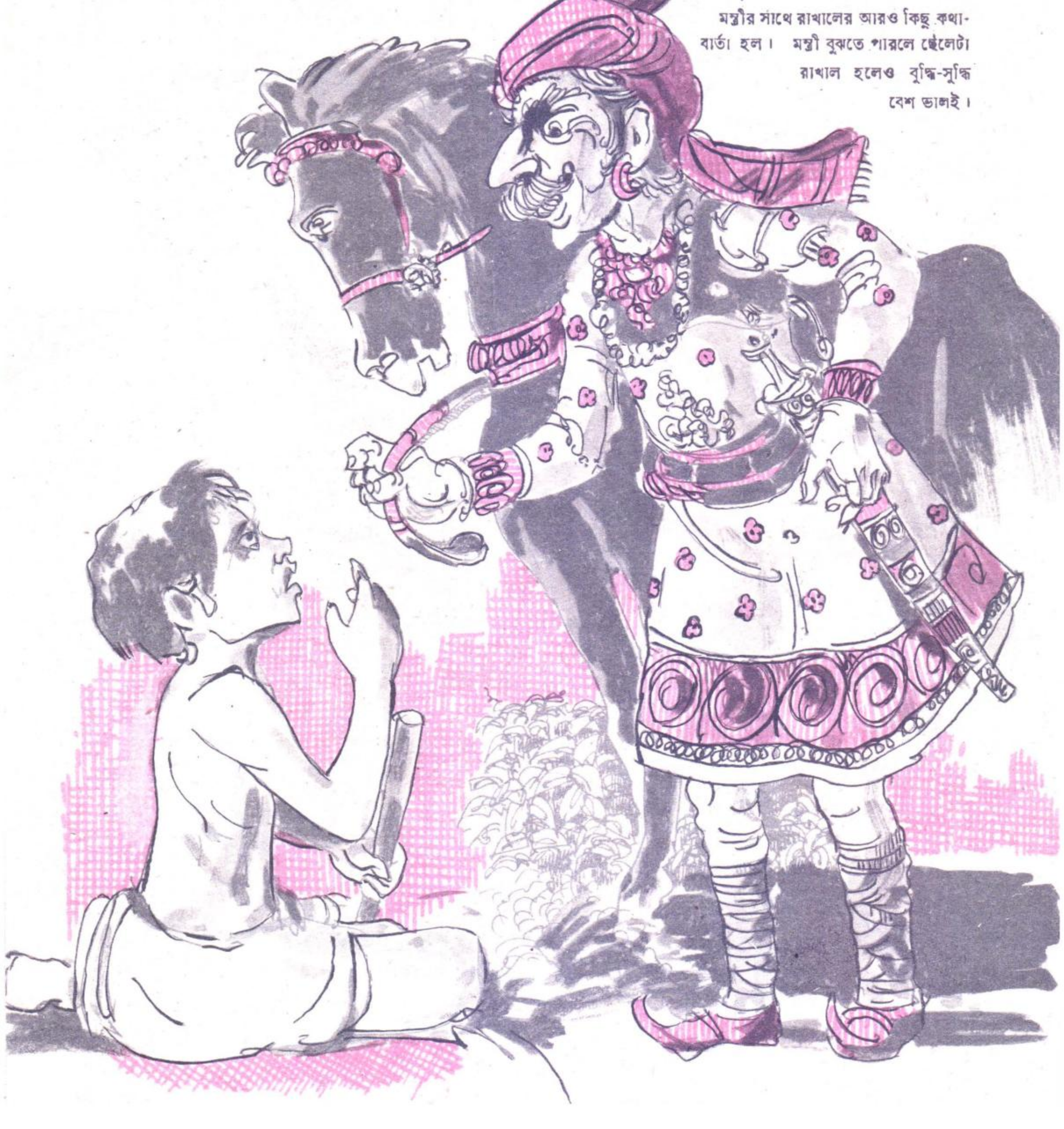

মন্ত্রী রাখালকে বললে, এই ছোঁড়া, আমার বাড়িতে কাজ করবি ? তোকে খেতে পরতে দোব, আর আমার বাড়িতেই থাকবি।

রাখাল হেসে বললে, আরাম করে থাকতে, খেতে, শুতে কে আর চায় না বল ? বেশ আমি কালকে যাব। আজ গরুগুনো আমার মনিবের বাড়িতে পৌঁছে তো দিতে হবে।

পরের দিন থেকে রাখাল মন্ত্রীর বাড়িতে থাকতে লাগল। খায়-দায় ঘুরে-ঘারে বেড়ায়। যেমন মন হয় অল্প-সল্প কাজ করে।

দেশের রাজা একদিন রাতে ভগবানকে স্বপ্ন দেখলে। খুব সকালেই রাজা মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালে। মন্ত্রী রাজার কাছে হাজির হয়ে বললে, রাজামশাই, এত সকালে কী কারণে আমাকে ডেকে পাঠালেন ?

রাজা মন্ত্রীকে বললে, এখনই ভগবান কী করছে—এটা যে আমাকে বলতে পারবে আমি তাকে অনেক পুরস্কার দোব।

রাজার কথা শুনে মন্ত্রী বড় চিন্তায় পড়ল। রাজা প্রচুর পরস্কার দেবে—সে কথাও মন্ত্রীর মনে পড়তে লাগল।

দুদিন যায়, চারদিন যায়। রাজা মন্ত্রীকে শুধোয়, কই মন্ত্রী, লোক পেলে ? আমার মন যে ভীষণ ছটফট করছে।

মন্ত্রী উত্তর দেয়, আজ্ঞে, লোক তো মিলছে না। যাকে জিজ্ঞেস করি সেই বলে, ভগবান এখন কী করছে সেকথা কি মানুষে বলতে পারে ?

মন্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে রাজা বললে, তাহলে উপায় ?

মন্ত্রী বললে, এক রাখাল ছেলে আছে আমার বাড়িতে। সে ব্যাটার ভয়ানক বুদ্ধি। যদি অনুমতি করেন তবে তাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখতে পারি।

রাজা বললে, নিশ্চয়ই তা করতে পার। দরকার মনে করলে রাজবাড়িতে নিয়ে এস।

মন্ত্রী বাড়ি ফিরে রাখালকে কাছে ডাকলে। বললে, এই ব্যাটা, তোর তো খুব পাকাপাকা বুদ্ধি। বলতে পারিস— এখন ভগবান কী করছে ?

রাখাল হেসে বললে, এই কথা ? সে এখন দেখে এলেই হবে। ও আর এমন কী কাজ।

রাখালের কথা শুনে মন্ত্রী অবাক হয়ে বললে, বলিস কীরে ব্যাটা, তুই ভগবানকে দেখে আসবি !

—তা তো বটেই। কিন্তু তোমাদের রাজা সেজন্যে কী দেবে ?

—তুই যদি বলতে পারিস, তবে রাজা তোকে প্রচুর পুরস্কার দেবে।

পুরস্কারের কথা শুনে রাখাল বললে, আচ্ছা, অমন করে যখন বলছ—তখন দু-একদিন পরে ভগবানকে দেখে এসে বলব সব।

মন্ত্রীর আর দেরি সহ্য হয় না। রাখালকে বললে, দু-একদিন পরে নয় বাবা, আজই তোকে ভগবানের কাছে যেতে হবে।

রাখাল বললে, আচ্ছা। তাই না হয় হবে। সন্ধেবেলায় যাব।

সন্ধেবেলায় রাখাল একটা লম্বা মই জোগাড় করে সেটা কাঁধে নিয়ে মন্ত্রীর সামনে হাজির। মন্ত্রী বললে, এ কী রে ব্যাটা, এত বড় লম্বা মই কী হবে ?

রাখাল বললে, এই মই দিয়ে উঠেই তো উঁকি মেরে দেখে আসব—ভগবান ব্যাটা এখন কী করছে।

মন্ত্রী অবাক হয়ে বললে, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিস না তো ?

রাখাল হেসে বললে, তুমি আমাকে খাওয়াচ্ছ পরাচ্ছ। তোমার সঙ্গে ঠাট্টা ? আচ্ছা, এক কাজ কর। আমাকে ভাল-মন্দ বেশ করে খাইয়ে দাও দিকিনি। আমি চট করে ভগবানকে দেখতে বেরিয়ে পড়ি।

মন্ত্রী তাই করলে। রাখাল মনের আনন্দে ভালমন্দ খেয়ে মইটা কাঁধে নিয়ে অন্ধকারে বাইরে চলে গেল। মন্ত্রী গভীর চিন্তায় ঘরের মধ্যে কেবল পায়চারি করতে লাগল।

একটু পরেই রাখাল ফিরে এল। মন্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে রাখালের কাছে যেয়ে বললে, কী দেখলি ব্যাটা ?

রাখাল গম্ভীর হয়ে বসে রইল। উত্তর দিলে না।

মন্ত্রী আবার বললে, আমার যে আর সহ্য হয় না। বল বাবা, ভগবান এখন কী করছে।

রাখাল বললে, সে অনেক কিছু করছে। অতসত্ত এখন বলা যাবে না। যা বলার রাজার সামনেই কাল সকালে বলব। এখন আমি খুব আলাস্ত। আমার ঘুম পাচ্ছে।

এই বলে রাখাল সোজা যেয়ে শুয়ে পড়ল নিজের ঘরে। মন্ত্রী নিরুপায়। প্রায় জেগেই রাতটা কাটিয়ে দিলে।

খুব সকালেই রাখালকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রী রাজবাড়িতে এসে উপস্থিত হল। রাখালকে দেখিয়ে মন্ত্রী রাজাকে বললে, এ-ই সেই ছেলে। গতকাল সন্ধেবেলায় ও ভগবানের সঙ্গে দেখা করে এসেছে। ভগবান কী করছে তাও দেখে এসেছে।

কথাটা শুনে রাজার খুবই আনন্দ। সিংহাসনে বসে রাখালকে রাজা বললে, বল ব্যাটা, ভগবানকে কেমন অবস্থায় দেখে এলি ?

রাখাল বললে, তুমি তো আচ্ছা রাজা। ভগবানের সঙ্গে যে অতকষ্ট করে দেখা করে এল তাকে তুমি কোন আপ্যায়ন করলে না ? খাওয়া-দাওয়া হবে, তবে তো থিতিয়ে-জিড়িয়ে সব বলব।

রাজা তখনি রাখালের খাওয়ার ব্যবস্থা করবার আদেশ দিলে। খাওয়া দাওয়া সেরে রাখাল আবার রাজার সামনে এসে দাঁড়াল। রাজাকে বললে, একটু উঠে এস সিংহাসন ছেড়ে। তবে তো সব কথা বলব।

রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে এল। রাজবাড়িতে আসবার সময় রাখাল সঙ্গে দুখানা গামছা এনেছিল। একখানা গামছা রাখাল পরেছিল। আর একখানা পাগড়ির মতো করে তার মাথায় বাঁধা ছিল।

রাজাকে রাখাল বললে, আমার মাথার গামছাটা তুমি তোমার মাথায় পাগড়ির মত পর। আর তোমার মুকুটটা আমার মাথায় পরিয়ে দাও। তোমার ঐ রাজপোশাকটা আমাকে পরতে দিয়ে আমার গামছাটা তুমি পর।

রাখালের কথামত রাজা তাই করলে। এবার রাখাল যেয়ে ধপ করে সিংহাসনে বসে বললে—আচ্ছা রাজা-মশাই, বল দিকিনি, এবার আমাকে কেমন দেখাচ্ছে ?

রাজা বললে—ঠিক রাজার মত দেখতে লাগছে।

রাখাল বললে—তোমায় কেমন লাগছে ?

রাজা উত্তর দিলে—রাখালের মতো লাগছে আমাকে।

রাজবেশী রাখাল হেসে বললে, ভগবান এখন কী করছে জান ? ভগবান এখন রাজাকে রাখাল আর রাখালকে রাজা করছে। এইটি তার কাজ। নাও, এবার তোমার পোশাক তুমি নাও, আর আমারটা আমাকে ফিরে দাও।

এই বলে পোশাক পাল্টে নিয়ে রাখাল মন্ত্রীকে বললে, চল, বাড়ি চল এবার।

রাজা রাখালের ব্যাপার দেখে সব বুঝতে পারলে। রাখালকে প্রচুর ধন-সম্পত্তি দিয়ে পুরস্কৃত করলে।

মন্ত্রী রাখালকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি এসে ভাবতে লাগল—বাঃ, বেশ হল তো ?

আমি একজন মন্ত্রী। আমি কিছু পেনু না। আর ব্যাটা রাখাল ধনসম্পদ পেয়ে বড় লোক হয়ে গেল?

মন্ত্রী মনে মনে ঠিক করলে— রাখালকে আর বাঁচিয়ে রাখা ঠিক হবে না। ব্যাটাকে নির্ঘাত মেরে ফেলতে হবে। এই ভেবে মন্ত্রী একটা মতলব ঠিক করলে। মন্ত্রীর বাড়ির কিছু দূরে ছিল একটা বাজার। সেখানে মাংস বিক্রি হত। মাংসওয়ালার সঙ্গে মন্ত্রীর আগে থেকেই কথা ছিল— যার হাতে সে চিঠি লিখে পাঠাবে 'পুরে দাও'। তাকে যেন মাংসকোটা কলে (হাড়কাটে) পুরে দিয়ে মেরে ফেলা হয়।

দাদা, এখানে কোথায় রে?

মন্ত্রীপুত্র কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, জুয়োয় আমি হেরে যাচ্ছিরে! আমার সবই চলে গেছে।

রাখাল বললে, দাদা, তুই সরে যা। আমি একদান খেলছি।

মন্ত্রীপুত্রের জায়গায় রাখাল জুয়ো খেলতে বসে গেল। একটার পর একটা দান ধরে মন্ত্রীপুত্রের সব হারান জিনিস উদ্ধার করে ফেললে।

মন্ত্রীপুত্র আনন্দে রাখালকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। বললে, তুই কিজন্যে বাজারে এসেছিস?

ফিরে গেল। ভাবলে—মন্ত্রীপুত্র মাংস নিয়ে হয়ত অন্য পথ দিয়ে বাড়ি চলে গেছে।

বাড়ি পৌছোতেই মন্ত্রী রাখালকে দেখে অবাক হয়ে বললে, মাংস কই রে?

রাখাল বললে, কেন? মাংস দাদা আনেনি?

মন্ত্রী বললে, তুই কোথায় ছিলি?

রাখাল উত্তর দিলে,

বাজারে। দাদা

মন্ত্রী একদিন রাখালকে ডেকে বললে, যা ব্যাটা, বাজার থেকে মাংস নিয়ে আয়। তুইও খাবি, আমিও খাব।

রাখাল বললে, মাংস আনতে তো যাব, পয়সা দাও।

মন্ত্রী বললে, এই চিঠিটা নিয়ে যা। তাহলেই মাংসওয়ালা তোকে মাংস দেবে। পয়সা লাগবে না।

এই বলে 'একে পুরে দাও'—লেখা চিঠিটি রাখালের হাতে দিলে।

রাখাল চিঠি হাতে বাজারে যেয়ে হাজির হল। বাজারে অনেক দোকান-পত্তর। কী একটা পুজো উপলক্ষে মেলাও বসেছে। রাখাল বাজারে ঢুকেই দেখলে—মন্ত্রীর একমাত্র ছেলে জুয়োর আড্ডায় বসে একমনে জুয়ো খেলছে। জুয়াড়ি মন্ত্রীপুত্রের হীরের আংটি, ঘড়ি, টাকাকড়ি সবই একে একে নিয়ে নিয়েছে। এবার পোশাকটা জুয়োয় দান ধরেছে। রাখাল মন্ত্রীপুত্রের কাছে গেল। বললে.

রাখাল চিঠি বার করে বললে, তোর বাবা এই চিঠি দিয়ে দোকান থেকে মাংস নিয়ে যেতে বলেছে।

মন্ত্রীপুত্র আনন্দে রাখালের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে দিলে টেনে এক দৌড়। মাংসের দোকানের দিকে যেতে যেতে চেঁচিয়ে রাখালকে বলে গেল, তুই আরও খানিকক্ষণ বেশি করে জুয়ো খেলে জুয়াড়িকে জব্দ করে দে। আমি ততক্ষণে মাংসওয়ালার কাছ থেকে মাংস নিয়ে আসি গে।

দোকানে যেয়ে মন্ত্রীপুত্র মাংসওয়ালার হাতে চিঠিটা দিতেই মাংসওয়ালা চিঠিটা পড়লে। তারপর তাকে একটা ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই মাংসকোটা কলে তাকে পুরে দিলে। মন্ত্রীপুত্র শেষ হয়ে গেল।

এদিকে জুয়োখেলা শেষ করে রাখাল অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন দেখলে মন্ত্রীপুত্র এল না, তখন সে একাই বাড়ি

সেখানে জুয়ো খেলছিল। হেরে যাচ্ছিল বলে আমি খেলে তাকে জিতিয়ে দিতেই সে আমার কাছ থেকে চিঠিটা ছোঁ মেরে নিয়ে মাংসের দোকানে মাংস আনতে ছুটল। কেন, দাদা কি আসেনি এখনও?

মন্ত্রী হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, ওরে আমার কী সর্বনাশ হল রে! সে আর নেই রে!

মন্ত্রীর বাড়িতে হাহাকার উঠল। রাখাল সবকিছু জানতে পেরে মন্ত্রীকে বললে, আমি তো বলেছিনু সোজাপথে গেলে কেউ গর্তে পড়ে না, বাঁকাপথে গেলেই পড়ে। এবার সেকথা বুঝতে পারলে তো?

মন্ত্রী পুত্রশোকে পাগলের মত হয়ে গেল। আর রাখাল বড়লোক হয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগল।*

*বর্ধমান জেলার নিম্ন-দামোদর অঞ্চলের গ্রামের মানুষের মধ্যে প্রচলিত গল্প।

শিল্পী : তরুণ চক্রবর্তী

কথা চালার মজার কথা

চিঠি চাঁপাটি

বিকাশ বসু

মনে কর না বানান ভুল। চিঠিচাপাটি লিখলে ঠিক হয় না বলেই লিখেছি চিঠি-চাঁপাটি। 'চ' এর মাথায় চন্দ্রবিন্দুটা মোটেই ফাউ নয়।

আমার ভাইঝির নাম সুলেখা। ওর নাম পত্রলেখা হলেই ভাল হত। ওর হাতের লেখা একদম ভাল নয়। কিন্তু চিঠি লেখায় ওর জুড়ি মেলা ভার। ও আমাকে যেসব চিঠি লেখে, তাকে চিঠিচাপাটি না বলে চিঠি-চাঁপাটি বলাই উচিত।

এই তো সেদিন কেষ্টনগর থেকে আমাকে ছোট্ট একটা চিঠি পাঠিয়েছে।

প্রিয় কাকুমণি,

নতুন বছরে নতুন মেয়ে হবার চেষ্টা করছি। মানে ভাল মেয়ে হবার। তোমাকে একটা ধাঁধা বলছি।

আমাদের বাড়িতে চারটে লোক। আমার বাবা, মা, বোন আর চতুর্থজন কে?

অবশ্যই উত্তর চাই।

ইতি
উংকা

ওর ডাক নাম উংকা। ওর চিঠি পেলেই শংকা জাগে, আবার কি জানি কঠিন ধাঁধায় পড়ব। কি সব শক্ত শক্ত ধাঁধা যে জিজ্ঞেস করে। একটারও উত্তর মাথায় আসে না। কিন্তু আমিই বা অত সহজে হার মানব কেন? আমিও ওকে উল্টে ধাঁধা পাঠাই। সবাই নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, ধাঁধা জিজ্ঞেস করা যত সহজ, উত্তর করা তত সহজ নয়।

একবার ও একটা ছোট্ট ধাঁধা জিজ্ঞেস করে চিঠি পাঠাল—কোন দস্যু ঘরে থাকে?

পেয়েই আমি মাথা চুলকোতে লাগলুম। চুলকোতে চুলকোতে যখন মাথার চুল বেশ কিছু সাফ করে ফেলেছি, তখন ওর কাছ থেকে আবার চিঠি এল—

পারলে না তো। আমি জানতাম তুমি পারবে না। উত্তরটা হবে মগ। জলের মগ গো। মগ ঘরে থাকে না? আবার মগ দস্যুর নাম শোনোনি? ইংরিজি উচ্চারণে অবশ্য জলের মগ—এম-ইউ-জি মাগ। কিন্তু আমরা তো আর সাহেব নই, আমরা বাঙালীই।

আমি ওকে লিখে পাঠালুম ঃ

উংকা সোনা, তোমার পাঠানো ধাঁধা ও উত্তর পেয়েছি। বরাবর দেখেছি ধাঁধার সামনে পড়লেই আমি গাধা বনে যাই। কিছুতেই উত্তরটা মাথায় আসতে চায় না। অথচ দেখ, এমনিতে আমি বেশ বুদ্ধিমান। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়। এই দেখ না আমি তোমার জন্য অনেক বুদ্ধি খরচ করে কেমন একটা ধাঁধা বানিয়েছি। বল তো, কোন কাকা জলে ভর্তি? বুদ্ধি না থাকলে এমন ধাঁধা বানানো যায়। এবার দেখি তো তোমার কেমন বুদ্ধি, উত্তর দাও দেখি।

উংকার আমি তো প্রিয় কাকুমণি আছিই, তাছাড়া জ্যাঠতুতো, খুড়তুতো, পিসতুতো, মাসতুতো, পাড়াতুতো মিলিয়ে তার অনেকগুলো কাকা। কিন্তু তারা কেউ জলে ভর্তি নয়। তাদের মধ্যে আবার অনেকে জলকে রীতিমত ভয় পায় আমি জানি। তবে হার মানার পাত্রী উংকা নয়। সে লিখল ঃ

কাকুমণি এবার থেকে আরও একটু শক্ত দেখে ধাঁধা পাঠাবে। এতো সহজ ধাঁধা পাঠালে আর উত্তর পাবে না। তোমার ধাঁধার উত্তর খুব সোজা—মণ্টুকাকা। ঘণ্টায় ঘণ্টায় যা জল খায়। আমাদের বাড়িতে পা দিয়েই বলে, জল দাও আমার কল্যাণী।

আমি ওকে লিখে পাঠালুম ঃ

তোমার উত্তরটা হয়েছে আবার হয়নি। তোমার মণ্টুকাকা যখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় জল খান, তখন অবশ্যই সব সময় তিনি কিছুটা জলে ভর্তি মানছি। তবে তাঁর চেয়ে অনেক অনেক বেশি জলে ভর্তি থাকে টিটিকাকা। টিটিকাকাকে বোধহয় তুমি চেন না। টিটিকাকা হল দক্ষিণ আমেরিকার একটা হ্রদ। হ্রদ যখন তখন তা জলে ভর্তি থাকবে, একথা নিশ্চয়ই মানবে।

এভাবে জবর হেরে গিয়ে উংকা তো কিছুদিন চিঠি পাঠান বন্ধ করে দিলে। আমি দেখলুম ভাল বিপদ তো। লিখলুম ঃ

মাছের কাছে যেমন জল, আমার কাছে তেমনি উংকা সোনার চিঠি। জল না হলে যেমন মাছ একটুও বাঁচে না, উংকার চিঠি না পেলে আমিও তেমন বাঁচি না। শীগগীর চিঠি পাঠাও, নইলে মরে যাব।

ওর কাছ থেকে আবার চিঠি এল। তবে এবার আর ধাঁধা টাঁধা নয়, ছড়ার সঙ্গে ছবি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছবিটা আমারই।

অবিশ্যি ছবি দেখে আমি একটুও মজা পাইনি। অতো বিচ্ছিরি দেখতে আমি মোটেই নই। বেলের মত মাথায় কদম ফুলের মত খোঁচা চুল। আমি কি এইরকম দেখতে নাকি? নাকটা যেন গাড়িচাপা পড়েছে। দাঁতগুলো অনেকটা ঠাকুরমার ঝুলির খোক্কসদের মত, সঙ্গের ছড়াটা এইরকম—

ফোঁস ফাঁস, ফাঁস ফোঁস
দ্যাট ইজ বিকাশ বোস।

এরপর কি আর চিঠি চালাচালি চলে? বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অবিশ্যি কিছুদিন পরেই আবার শুরু হয়েছিল।

(২)

আবার যখন পত্রলেখা ও আমার মধ্যে চিঠি চালাচালি শুরু হল আমি ওকে লিখলুম ঃ

দেখ উংকা, তুমি বড় হচ্ছ। আর ধাঁধা নয়, কিছু কাজ কর। ধ-এ ধাঁধা আর ক-এ কাজ। আগে 'ধ'? না আগে 'ক'?

কদিন পরেই সে তার কাজের নমুনা পাঠাল। চিঠির বদলে এল ইস্কাবনের টেক্কা, মানে প্রথমে পেন্সিলে এঁকে তারপর কাঁচি দিয়ে কেটে ইস্কাবনের টেক্কা বানানো হয়েছে। সেই ইস্কাবনের টেক্কার মধ্যে কালি দিয়ে লেখা নানান খবরাখবর। চিঠিটা দেখতে এইরকম ঃ

প্রিয়
কাকুমণি,
তোমার দেওয়া
fill in-টা করেছি।
আমার কটা পুজোর জামা
হয়েছে জান? তোমার জন্যে
একটা সুন্দর কার্ড বানিয়েছি।
বিজয়ার পরে পাঠাব। নজরুলের জন্যে
একটা কবিতা লিখেছি। সেটা
P. T. O.-তে দিয়েছি। তুমি ভাল আছ
তো? আমরা Madras যাচ্ছি
কবে? ইতি উংকা
পুনঃ
আমার
অনেক চুল
হয়েছে।

তোমাদের বলতে ভুলেছি কিছুদিন আগে ওকে ন্যাড়া করে দেওয়া হয়েছিল। ইস্কাবনের টেককার বোঁটার দিকে ও নিজের কেশবতী ছবিটা এ'কে দিয়েছে।

আর ঐ যে ইস্কাবনের টেককার মধ্যে লিখেছে, নজরুলের জন্যে একটা কবিতা লিখেছি, সেটা কি রকম উৎরেছে শোন।

কবি নজরুল ইসলাম

ধন্য কবি হে নজরুল ইসলাম
তোমার তরে আজকে পাঠাই প্রণাম।
তোমার তরে করি মাথা নত
তোমারে প্রণাম জানাই শত শত।
দেশের প্রতি তোমার একি অসীম ভালবাসা
আমাদের মুগ্ধ করতে জগতে তোমার আসা।
গান ও কবিতা দিয়ে ভরে রাখ আমাদের মন
বাংলার তুমি গরবের কবি, বাংলার তুমি ধন।

আমাদের বাড়ির মেয়ে কবি হয়ে যায় দেখে আমি তো মাথায় হাত দিয়ে বসলুম। ওকে আমরা ডাক্তার করব ঠিক করে রেখেছি। আমাদের বাড়ির সবাই হয় ইঞ্জিনীয়ার, নয় বৈজ্ঞানিক, নিদেন পক্ষে মেকানিক বা ফিটার। কি সর্বনাশ, আমাদের বাড়ির মেয়ে শেষে কবি হয়ে যাবে? আমি তৎক্ষণাৎ লিখলুম:

প্রিয় উংকা,

যদিও 'ক' এ কাজও হয় আবার কবিতাও হয়, তবু কাজ মানে কবিতা নয়। আমরা চাই তুমি মেয়ে-কবি না হয়ে, কাজের মেয়ে হও। ইতি,

কাকুমণি

চিঠি পেয়েই ও লিখল:

কবিতা লেখা যদি কাজ না হয়, তাহলে কি কাজ আমাকে করতে হবে বলে দাও।

আমি লিখলুম:

এখন তোমার নামতার বয়েস, মানে মন দিয়ে নামতা মুখস্থ করার বয়েস।

তুমি তাই করবে। এবার যখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে, তখন নামতা ধরব কিন্তু।

তাছাড়া চিঠিতে বেশ ভাল করে লিখে দিলুম নামতার মহাগুণাবলী। নামতার এক নম্বর গুণ হল, নামতা জানা না থাকলে কোন রকম গুণই করা যায় না। শুধু গুণই নয়, গুণের উল্টো ভাগ, তাতেও নামতা লাগে। এদিকে আবার যোগের সহজ উপায়ই হল গুণ। বাকি রইল শুধু বিয়োগ। সেটাও নাকি আসলে যোগই। তাহলে প্রমাণ হল কি, নামতা না হলে অংক শেখাই হয় না। আর অংক না শিখলে কিছুই শেখা হয় না। অতএব তুমি কি ডাক্তার হতে চাও, নাকি চাও না?

এর উত্তরে ওর চিঠি এল না, এল ওর লেখা এক গল্প—নাম 'নামতাবাবু'। গল্পটা এইরকম:

নামতাবাবু

নামতাবাবু আমাকে খালি বিরক্ত করে। আর একটা রাত কাটলেই আমার জন্মদিন। বাবা সুকুমার রায়ের লেখা বহুরূপীটা এনেছিল। রাত্রে বসে বসে বইটা পড়ছি। এমন সময় এসে দাঁড়ালেন নামতাবাবু। বললেন, 'বল দেখি আট বারো কত?'

বললাম, 'জানি না যাও।'

ভাবলাম কোথায় জন্মদিনের জন্যে greet করবে, তা না এসে নামতা জিজ্ঞেস করছে।

কিন্তু তিনি আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। বললেন, 'থাক, কাল তোমার জন্মদিনটা হয়ে যাক।'

সকালে উঠেই দেখি ছোটমামা এসে গেছে। সঙ্গে একটা কথা-বলা ভাল্লুক।

সকাল দশটায় বড়মাসি এল, সঙ্গে বই।

তারপর বড় মামা, সঙ্গে এক বাক্স রঙের tube।

তারপর মেজোমাসি দিল ফুলদানি। বলল, তাড়াতাড়িতে ফুল কিনতে পারিনি। শুধু ফুলদানিটাই নে।

তারপর ছোটমাসি, সঙ্গে একটা বড় ডল।

অবশেষে এলেন নামতাবাবু, হাতে একটা বই। বইয়ের নাম—Mathematics Around you. জন্মদিনে এরকম বিচ্ছিরি বই কেউ উপহার দেয়? সেদিন খুব রাগ হয়েছিল।

সব উপহার দেখা হয়ে গেলে অনেক কষ্টে হাত বাড়ালাম নামতাবাবুর দেওয়া বইয়ের দিকে। খুলে মন আমার জুড়িয়ে গেল। এত সুন্দর করে বোঝানো হয়েছে, আমি বইটা ছাড়তে পারলাম না, এরকম অংকের বই আমি আর দেখিনি।

এরপর আমি অংকে খুব ভাল হয়ে গেছি। নামতাবাবুর কাছে পড়ি, আর প্রায়ই ক্লাসে প্রথম হই। তার জন্যে নামতাবাবুকে অশেষ ধন্যবাদ।

আর এই নামতাবাবু কে জান? কে আবার?—কাকু।

ছবি: পোলারিস

চাইতে জানলে

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চাওয়ার মত চাইতে জানলে
সব কিছু যায় পাওয়া,
ইচ্ছা-পূরণ হয় কি শুধু
গায় লাগালে হাওয়া?
গাওয়ার মত গাইতে জানলে গান,
শোনার মত তৈরি হলে কান—
হাওয়ার পিছে করতে হয়-না ধাওয়া,
হাওয়া তখন এগিয়ে এসে
করতে বসে হাওয়া,
চেষ্টা করলে দূর আকাশের
চাঁদকেও যায় পাওয়া।

ছবি: জি. শর্মা

বায়ু নিশান

দিলীপ কুমার পাঠক

আবহাওয়া বিজ্ঞান আমাদের রোজই খবর দিচ্ছে আগামীকাল আবহাওয়া কেমন থাকবে। তার জন্যে বিভিন্ন যন্ত্র আছে। কোনও যন্ত্র বায়ুর চাপ নির্ণয় করে, কোনও যন্ত্র বায়ুর গতিবেগ মাপে। আবার বায়ুর দিক নির্দেশ করে যে যন্ত্র তার নাম বায়ু নিশান। অনেক পুরনো বাড়ির ওপর এই বায়ু নিশান দেখা যায়। এখানে যে বায়ু নিশানটি পাবে তার বিশেষত্ব হল বায়ু নিশানটি থাকবে ছাদের ওপরে আর ঘরে বসে বায়ুপ্রবাহের দিক জানা যাবে।

কি কি জিনিস লাগবে

১. ৮''×৪'' টিনের পাত—১টি

২. ¼'' মোটা, ১½' লম্বা পিতল বা লোহার দণ্ড—১টি

৩. ১ ফুট লম্বা, ২''×১'' কাঠের টুকরো—৩টি

৪. ১'×১' প্লাইউড—১টি

৫. ৩ ভোল্টের টর্চের বাল্ব —৮টি

৬. পিসবোর্ডের বা কাঠের বাক্স যাতে ৮টি খোপ করা আছে—১টি

৭. পিতলের পাতের টুকরো—৮টি

৮. বাদ্যযন্ত্রে ব্যবহৃত ব্রোঞ্জের মোটা তার—৪'' লম্বা

৯. টর্চ লাইটের বাল্ব হোল্ডার—৮টি

১০. বল বিয়ারিং-এর বল—১টি

কি ভাবে তৈরি করবে

যন্ত্রটির দুটি অংশ—একটি তীরের মত, অন্যটি খোপ কাটা বাক্স। বাক্সটির এক একটি খোপের মধ্যে একটি করে ছোট ছোট বাল্ব বসান আছে।

'ক' দণ্ডটির দুদিকে 'খ' এবং 'গ' দুটি টিনের পাত লাগান আছে। 'খ' তীরের ফলার মত এবং আয়তনে ছোট। 'গ'-র আয়তন বড় এবং এটি ৮''×৪'' পাত থেকে কেটে নেওয়া। পাত দুটি (খ ও গ) পিতলের দণ্ড 'ক'-র সঙ্গে ঝাল দিয়ে লাগান। আর একটি দণ্ড 'ঘ', 'ক'-র সঙ্গে লম্বভাবে জোড়া আছে। এবার 'ঙ' পাটাতনের ওপরে 'চ', 'ছ' ও 'জ' কাঠের টুকরো ৩টি এমনভাবে লাগাতে হবে যাতে 'চ' ও 'ছ', 'ঙ'-র ওপরে লম্বভাবে থাকে আর 'জ' থাকবে 'চ' ও 'ছ'-এর ওপরে আড়াআড়িভাবে। 'জ'-এর মাঝখানে একটি ছিদ্র আছে যার মধ্য দিয়ে 'ঘ' দণ্ডটি সোজাসুজি নেমে এসে 'ঙ'-র ওপর লম্বভাবে দাঁড়াবে 'ঝ' বিন্দুতে। এই জায়গায় ছোট একটি গর্ত করা আছে এবং ঐ গর্তের মধ্যে একটি বল-বিয়ারিং-এর স্টীলের বল রাখা আছে। 'ঘ' দণ্ডটি ঐ বলের ওপরে দাঁড়ালে বেশ ভালভাবে ঘুরতে পারে। এবার বাতাস বইতে থাকলে 'ক' দণ্ডটি ঘুরে গিয়ে 'খ' অংশ নির্দেশ করবে কোন দিক থেকে বাতাস বইছে।

একটি চার-পাঁচ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত বৃত্তাকার প্লাইউডে (ঞ) চিত্রে দেখান ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি করে ৮টি ছোট ছোট পিতলের টুকরো সমান দূরে দূরে লাগাতে হবে। প্লাইউডের চাকতিটির মাঝখানে ছিদ্র করা থাকবে যেন লম্ব দণ্ডটি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়ে নিচে পাটাতনের গর্তে রাখা স্টীলের বলের সঙ্গে সংযোগ করতে পারে। স্টীলের বলটির পাশে এক টুকরো পিতলের পাত শক্ত করে বলটিকে ছুঁয়ে থাকবে। এবার চাকতির ওপর লাগান পিতলের এক একটি পাতের সঙ্গে এক একটি তার ঝেলে নিতে হবে। আর বলটিকে ছুঁয়ে থাকা পিতলের পাতটি থেকেও একটি তার 'ট' ঝেলে বের করে নিতে হবে। 'ঘ' দণ্ডটির নিচের দিকে 'ঠ' বিন্দুতে একটি ব্রোঞ্জের তার (ড) ঝেলে দিতে হবে এবং যখন তীরটি ঘুরবে তখন এই তারটি প্রতিটি পিতলের পাত ছুঁয়ে যাবে।

একটি কাঠের বা পিসবোর্ডের বাক্সে ৮টি খোপ করা আছে। প্রতিটি খোপের মধ্যে হোল্ডার দিয়ে একটি করে ছোট টর্চের বাল্ব লাগান আছে। প্রতিটি বাল্বের হোল্ডার থেকে দুটো করে তার বের করা আছে। প্রতিটি হোল্ডারের একটি করে তার নিয়ে তাদের প্রান্তগুলো একসঙ্গে যুক্ত করে সেই সাধারণ তারটি ব্যাটারীর (চিত্রে 'ঢ') একটি প্রান্তের সঙ্গে যোগ করে দিতে হবে। ব্যাটারীর অন্য প্রান্ত 'ট' তারটির সঙ্গে যোগ করা থাকবে। এবার প্রতিটি বাল্ব হোল্ডারের অন্য প্রান্তগুলো যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি তারের সঙ্গে যোগ করে দিতে হবে।

কি ভাবে কাজ হবে

তীরের ফলাটি বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে হবে যে ড তারটি কোন পিতলের পাত ছুঁয়ে কোন বাল্বটি জ্বালাচ্ছে। ধরা যাক দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস আসার সময় ব্রোঞ্জের তারটি ৪নং পিতলের পাতটি ছুঁয়ে থাকছে। ব্যাটারী থেকে বিদ্যুৎ 'ট' তার দিয়ে স্টীলের বলটির মধ্য দিয়ে 'ঘ' দণ্ডের মাধ্যমে ব্রোঞ্জের তার দিয়ে ৪নং পিতলের পাতের মধ্য দিয়ে ঐ পিতলের পাতটি যে বাল্বের সঙ্গে যুক্ত সেই বাল্বটি জ্বালাবে। ঐ বাল্বের খোপটির সামনে একটি ট্রেসিং পেপার লাগিয়ে 'দক্ষিণ' কথাটি লিখে আঠা দিয়ে লাগাতে হবে। এইভাবে প্রতিটি খোপের সামনে এক একটি দিক যেমন পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ইত্যাদি লিখে নিতে হবে। এবার প্রথম অংশটি ছাদের কোনও জায়গায় রেখে ঘরের ভেতরে দ্বিতীয় অংশটি রেখে লম্বা তারের সাহায্যে সংযোগ করে দিয়ে কোন দিক থেকে বাতাস বইছে তার নির্দেশ পাওয়া যাবে। □

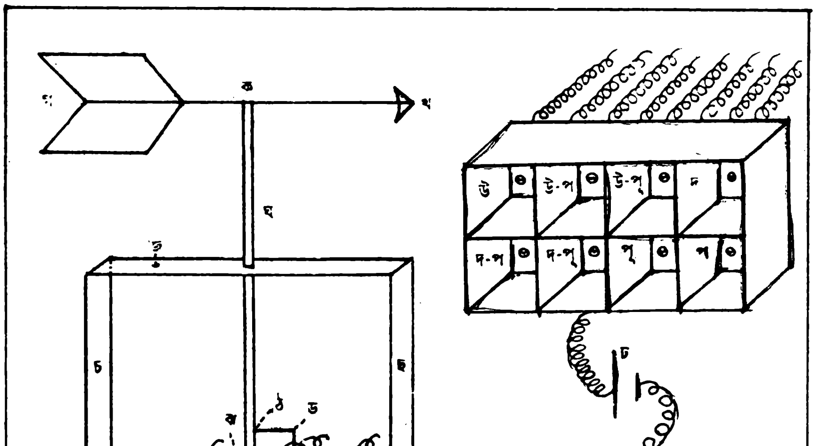

বিজ্ঞানের খবর

পূর্ব ভারত বিজ্ঞান শিবির

গত ১০-১৭ *ফেব্রুয়ারি '৮৪ বিড়লা* শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালায় সারা পূর্বভারত বিজ্ঞান শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। শিবিরের উদ্যোক্তা ছিল বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তর।

১০ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪টেয় শিবিরের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার উপমুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী (মাধ্যমিক) কান্তি বিশ্বাস।

এবারের শিবিরে যোগদান করে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর, মিজোরাম, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং নাগাল্যাণ্ডের ১৫২টি স্কুল এবং বিজ্ঞান ক্লাবের ২১৮ জন ছেলেমেয়ে।

শিবিরে অন্যবারের মত এবারেও হাতে-কলমে শিক্ষার জন্য পাঁচটি 'ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্প'-এর ব্যবস্থা ছিল। যেমন, ১. প্যাথলজিক্যাল টেস্ট অফ ব্লাড, ২. জিওলজি, ৩. লাইফ সায়েন্স, ৪. ইলেকট্রনিক্স এবং ৫. ওরিগেমি।

শিবিরে অংশগ্রহণকারীরা আটদিন ধরে দর্শকদের সামনে নিজেদের মডেলের বিবরণ, কাজ, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা—এসব ব্যাখ্যা করেছে অক্লান্তভাবে। এই দিনগুলোতে তারা পেয়েছে বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ভাষাভাষি, বিভিন্ন সংস্কৃতির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পারস্পরিক মেলামেশার সুযোগ। প্রদর্শনী দেখতে আসেন প্রায় তের হাজারেরও বেশি দর্শক।

আট দিনের এই শিবিরে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে উড়িষ্যার বালাসোরের সেণ্ট ভিন-সেন্টস কনভেন্ট স্কুলের ছাত্রী কুমারী সোনালী পিরি। তার মডেলের নাম 'অডিও স্পিরিট লেভেল ফর ব্লাইণ্ড'। সোনালী তার মডেলের সাহায্যে দেখিয়েছে অন্ধরা তার যন্ত্রের সাহায্যে পথ চলার সময় শব্দের মাধ্যমে কিভাবে সামনের খানা, ডোবা, উঁচু-নিচু ইত্যাদির অস্তিত্ব অনুভব করবে। তার যন্ত্রে আরও দেখান হয়েছে অন্ধরা শব্দ শুনে কিভাবে দাঁড়িপাল্লায় কোন বস্তুর সঠিক ওজন পরিমাপ করবে। সোনালীর যে গুণটা দর্শকদের সবচেয়ে বেশি চমৎকৃত করেছিল, তা হল ওর বাচনভঙ্গী। সে যেভাবে দর্শকদের সামনে তার মডেলের ব্যাখ্যা করছিল তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। পুরস্কার হিসেবে সে পেয়েছে মাসিক ১৫০ টাকা হিসেবে এক বছরের বৃত্তি এবং একটি মানপত্র। তার মডেলটি শ্রেষ্ঠ মডেল হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য আচার্য *জে সি বোস চ্যালেঞ্জ* ট্রফিটিও তাকেই দেওয়া হয়।

মাসিক ১০০ টাকা হিসেবে এক বছরের বৃত্তি দেওয়া হয়েছে সাতজনকে। এছাড়া অনেকগুলো বিশেষ পুরস্কারেরও ব্যবস্থা ছিল।

আটদিন ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানগুলোতে পূর্ব ভারতের নটি রাজ্য থেকে আগত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মোট ২২ জনকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে বিজ্ঞান প্রতিভা খুঁজে বের করে আনা, ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞান ঔৎসুক্য বাড়ান এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ভাষাভাষি বিভিন্ন সংস্কৃতির ছেলেমেয়েদের পারস্পরিক মেলামেশার সুযোগ করে দেওয়াই ছিল এই শিবিরের উদ্দেশ্য।

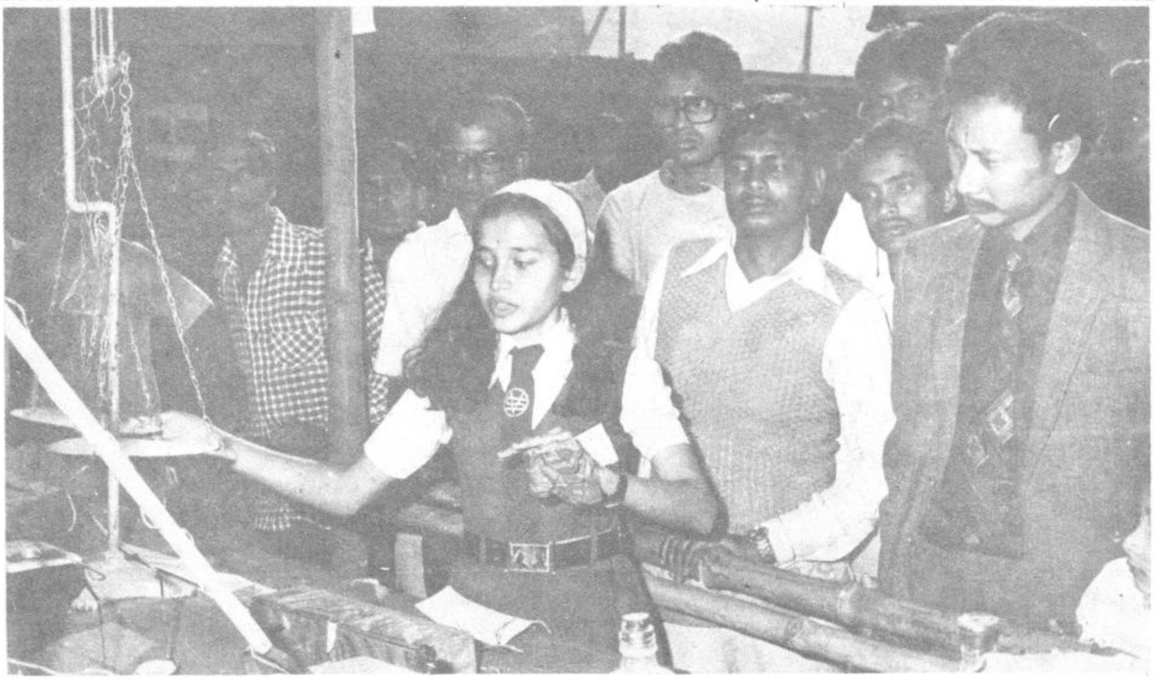

সোনালী পিরি মডেল দেখাচ্ছে অরুণাচলের ডেপুটি স্পীকার শ্রীরাজকুমারকে। ছবি: বি আই টি এসের সৌজন্যে

কিডনীতে পাথর

যাদের কিডনীতে পাথর হয়েছে তাদের রোগমুক্তির জন্য একটি নতুন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এর ফলে রোগীকে তার রোগ নিবারণের জন্য আর শল্য চিকিৎসার প্রচলিত পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে না।

শল্য চিকিৎসার এই নতুন পদ্ধতিতে প্রথমে কিডনীর বাইরের দিকের চামড়ায় ছিদ্র করে যন্ত্রটি প্রবেশ করান হয়। যন্ত্রটি শব্দতরঙ্গের সাহায্যে কিডনীর পাথরকে ভেঙে দেয়। □

যন্ত্রের যাদুকর নিকোলা টেসলা

বিশ্বজিৎ দাস

সালটা ১৮৯৩।

চিকাগোয় অনুষ্ঠিত হচ্ছিল 'বিশ্বমেলা'; মেলার সমস্ত দর্শক এসে ভীড় করে দাঁড়াতেন একটা বিশেষ প্যাভেলিয়ানের সামনে। সেখানে লম্বা কোট, ছাই রং-এর ডোরাকাটা ফুলপ্যান্ট, লম্বা সিল্কের টুপী আর জরির কাজ করা জ্যাকেট পরা এক বিজ্ঞানী খেলা দেখাতেন।

কালো ভেলভেট মোড়া মঞ্চের ওপর থাকত ইস্পাতের তৈরি একটা ডিম; একটা ছোট্ট সুইচ টিপে দেওয়া মাত্র সে ডিমটা সোজা হয়ে দাঁড়াত, তারপর লাট্টুর মত বন বন করে পাক খেত। সারা মঞ্চে সৃষ্টি হত নানান রঙের আলোর উজ্জ্বল বর্ণালী; আলোর আঘাতে দরজা খুলে যেত। ডায়নামোর সঙ্গে সংযুক্ত করা একটা তার বিজ্ঞানী নিজে হাতে ধরে থাকতেন, আর তার উন্মুক্ত প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে আসত দশ লক্ষ ভোল্টের বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ : প্রায় ছ'ফুট লম্বা; সে স্ফুলিঙ্গ গলিয়ে দিত টেবিলের ওপর রাখা একটা তামার পাতকে। এখানেই শেষ নয়, বিজ্ঞানী এবার আর একটু এগিয়ে এলেন, তারের উন্মুক্ত প্রান্ত নিজের হাতে ধরে রইলেন আর অপর হাত ছুঁয়ে রইল তামার পাতটিকে। সুইচ টেপা হল; তামার পাতটা গলে গেল, কিন্তু কি আশ্চর্য, বিজ্ঞানী সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় দাঁড়িয়ে! বিজ্ঞানী দর্শকদেরও ডেকে আনতেন মঞ্চের ওপর, তাদের দেহের মধ্যে দিয়েও প্রবাহিত করতেন দশ লক্ষ ভোল্টের বিদ্যুৎ; কিন্তু কেউই এতটুকু কষ্ট অনুভব করতেন না।

এই যাদুকরের মত অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী বিজ্ঞানীর নাম নিকোলা টেসলা। জন্মেছিলেন তদানীন্তন ক্রোয়াশিয়া নামে পরিচিত সার্বিয়ার লিকা প্রদেশের ছোট্ট শহর স্মিলযানে, ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে।

বাবার নাম ছিল রেভারেণ্ড মিলুটিন টেসলা, অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ছিল তাঁর, পুরো বাইবেল ছিল কণ্ঠস্থ। মায়ের নাম দ্জুকা। ছোটবেলায় নিকোলাকে তাঁরা সবাই ডাকতেন নিক্কি বলে।

নিক্কির বয়েস তখন খুবই কম, ৭/৮ বছর হবে। তখন থেকেই তার মনে অদ্ভুত সব কাজ করার ইচ্ছে জাগত; যেমন, তার ইচ্ছে ছিল সে জলের শক্তিকে ধরে তাকে দিয়ে কঠিন কঠিন সব কাজ করাবে, কিংবা একা একা আকাশে উড়ে বেড়াবে…এইরকম। ওড়ার চেষ্টা করতে গিয়ে নিক্কি তার পাঁজরের তিনখানা হাড় ভেঙেছিল।

একদিন সে তৈরি করে খেলনা গুলতির মতই অদ্ভুত একটা ধনুক। নিক্কির ধনুকের কার্যকলাপ দেখে বন্ধুদের এতই ভাল লাগল যে তারা সবাই একটা করে ঐরকম ধনুক নিক্কির কাছ থেকে কিনে নিল। নিক্কি বুঝল যে তাহলে চাকরি করা ছাড়াও অর্থ উপার্জনের আরও পথ আছে।

সার্বিয়ার পড়াশোনা শেষ করার পর নিক্কি চলে এল অস্ট্রিয়ার গ্রাজ শহরের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে। সারাদিনে

মাত্র চার ঘণ্টা ঘুমোবার জন্য বরাদ্দ ছিল; বাকি প্রায় সমস্ত সময়টাই চলত নিক্কির নানা রকম পড়াশোনা; ফলে সমস্ত বিষয়ে তার অসাধারণ দক্ষতার চিহ্ন ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ইনস্টিটিউটে একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্র ছিল যেটাকে মোটর আর ডায়নামো দুভাবেই ব্যবহার করা যেত। যন্ত্রটার ক্রিয়াকলাপ দেখে নিকোলার মনে হল, এটায় এত বেশি স্ফুলিঙ্গ উৎপাদন হয় যে শক্তির অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়।

আসলে তখন তো একমুখী নিয়মিত প্রবাহ বা ডি. সি. বিদ্যুতেরই একমাত্র চলন ছিল। কিন্তু শক্তির এই অপচয় রোধ করার জন্য নিকোলার মাথায় এল পরিবর্তী প্রবাহ বা এ.সি. বিদ্যুৎকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা। আর তার জন্য চাই ঘূর্ণায়মান চৌম্বক ক্ষেত্র।

নিকোলার এই পরিকল্পনাকে বন্ধুরা, অধ্যাপকেরা সবাই একেবারে হেসে উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু নিকোলার রোখ চেপে গেল—এ. সি. বিদ্যুৎ দিয়ে তাঁকে মোটর ঘোরাতেই হবে।

ইতিমধ্যে পড়াশোনা সাঙ্গ করে নিকোলা কাজ নিলেন বুদাপেস্ট টেলিফোন কোম্পানীতে। সেখানেই তিনি আবিষ্কার করলেন টেলিফোন রিপিটার বা এ্যামপ্লি-ফায়ার। এই সময়েই এ. সি. বিদ্যুতে চলার উপযোগী মোটরের পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যোগাড় করে সেটা তৈরিও করে ফেললেন। মোটর ঘুরতে লাগল সম্পূর্ণ নিঃশব্দে; কোন স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হল না, কোন কম্পনও দেখা দিল না। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল যে এই মোটর তৈরির আগে তিনি কোন নকশা আঁকেননি; পুরো ব্যাপারটা আঁকা ছিল তাঁর মনের মধ্যে।

এরপর নিকোলা এসে যোগ দিলেন নিউইয়র্কের এডিসন কোম্পানীতে। এডিসন সেই সময়ের বিখ্যাত আবিষ্কারক নিকোলা সেই কোম্পানীর ডায়নামোগুলোর নানা পরিবর্তন করে সেগুলোকে আরো কার্যক্ষম করে তুললেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ চাকরিতেও নিকোলা ইস্তফা দিলেন। অন্য একটা কোম্পানীর সহযোগিতায় 'টেসলা আর্ক ল্যাম্প' তৈরি শুরু করলেন। কিন্তু সেখানেও বেশিদিন মন টিকল না তার। তাঁর ইচ্ছে সারা দেশে ডি. সি. বিদ্যুতের বদলে এ. সি. বিদ্যুতের প্রচলন শুরু হোক। একটা কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবস্থাও হল সেই মত। কিন্তু ডি. সি. বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানীরা প্রচার করতে লাগল এ. সি. বিদ্যুৎ অত্যন্ত বিপজ্জনক! তারই প্রত্যুত্তরে নিকোলা ঐ অদ্ভুত যাদুবিদ্যার মত খেলাগুলো দেখিয়েছিলেন। সাধারণের বিশ্বাস হল যে সত্যিই এ. সি. বিদ্যুৎ তেমন ভয়ংকর নয়, বরং তাতে সুবিধে অনেক বেশি।

অদ্ভুত এই প্রতিভাকে ১৯১২ সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে ঠিক করা হয়। কিন্তু যেহেতু এডিসন আর নিকোলা একসঙ্গে এই পুরস্কার পাবেন বলে নোবেল কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাই নিকোলা এ পুরস্কার নিতে অস্বীকার করেন। কারণ এডিসনকে নিকোলা সহ্য করতে পারতেন না।

১৯৪৩-এর ৮ জানুয়ারি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন এই যন্ত্রের যাদুকর; কিন্তু যে অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় তিনি রেখে গেলেন তা আজও বহু বৈজ্ঞানিকের ঈর্ষার বস্তু। □

শব্দচিন্তা

শব্দচিন্তার মূল উদ্দেশ্য হল—শব্দভাণ্ডার বাড়িয়ে তোলা, যাতে ভাষার ব্যবহারে পটুতা আসে। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে শব্দ-সন্ধানের মজাটুকুও পেয়ে যাবে তোমরা। গতবারের শব্দচিন্তা যেমন ছিল পাঁচ রকমের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে অর্থাৎ পঞ্চকেন্দ্রিক এবারের শব্দচিন্তা তেমনি 'ছয়' সংখ্যাকে নিয়ে। সূত্র-স্থানও চিহ্নিত করা হল। এবার চেষ্টা করে দেখ ঠিক ঠিক পার কিনা।

১। ষট্‌কর্ম বা ব্রাহ্মণের কৃত্য। করণীয় ছয় রকম কাজ ঃ

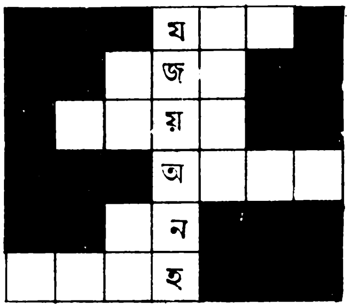

২। বৈদিক ষড়ঙ্গ বা বেদাঙ্গ ঃ

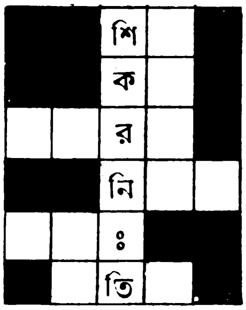

৩। ছয় প্রকার রস বা নির্যাস ঃ

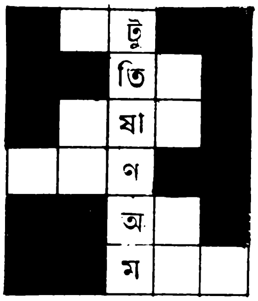

৪। ছয় বা ষড়্‌রিপু ঃ

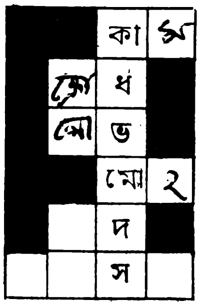

৫। ষট্‌চক্র বা শরীরের যৌগিক ছয় চক্র ঃ

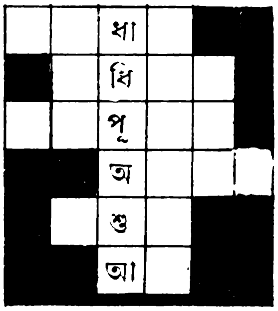

৬। পরিচিত একজন দেব বা দ্যুলোকবাসীর নাম ঃ

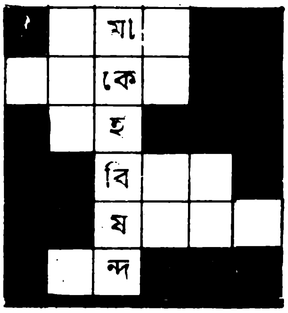

রুবি ভট্টাচার্য

শব্দচিন্তা ১-এর সমাধান

১. পুণ্ডরীক—শ্বেতপদ্ম ; কোকনদ—লালপদ্ম ; ইন্দীবর—নীলপদ্ম ; তামরস : উৎপল বা শতদল।

২. শশক—খরগোশ ; গোধা—গোসাপ ; শল্লকী—সজারু ; গণ্ডক বা গণ্ডার ; কূর্ম—কচ্ছপ।

৩. গণেশ—গজানন, বিনায়ক, লম্বোদর, হেরম্ব, গণপতি।

৪. প্রাণ, অপান—নিঃশ্বাস বা ত্যাজ্য বায়ু ; সমান—নাভি বা উদরের বায়ু ; উদান—কণ্ঠের বায়ু ; ব্যান—সারা দেহের বায়ু।

৫. শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা।

জানা প্রশ্ন ঃ অজানা উত্তর

চন্দনকুমার নাগ

আগের সংখ্যায় এই বিভাগে তোমরা পেয়েছিলে বিজ্ঞানের দশটি প্রশ্ন। এবারে দেওয়া হল আরও দশটি আর আগের বারের প্রশ্নগুলোর উত্তর। এ সংখ্যার প্রশ্নের উত্তর পাবে আগামী সংখ্যায়।

মনে রেখ, প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমরা পাঠাবে পত্রিকা প্রকাশের দশদিনের মধ্যে। প্রথম পাঁচজন সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে আগামী সংখ্যার পরের সংখ্যায়। উত্তরের সঙ্গে কুপন অবশ্যই পাঠাবে।

১) কোন মাছের ফুসফুস আছে ?
২) লেবুতে কোন ভিটামিন থাকে ?
৩) ছাপাখানা কে আবিষ্কার করেন ?
৪) প্রথম জীবনে কলেজের ভৃত্য, পরে বৈজ্ঞানিক হন কে ?
৫) সবচেয়ে শক্ত জিনিস কি ?
৬) কোন পাখির জিভ কাঁটায় ভর্তি থাকে ?
৭) বর্তনীতে বিদ্যুৎপ্রবাহ মাপার যন্ত্রের নাম কি ?
৮) রক্ত আমাশয়ের জীবাণুর নাম কি ?
৯) মাগুর-শিঙি মাছের শুঁড় কি কাজ করে ?
১০) কোন ফলের ভেতরে ফুল হয় ?

১৬ এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত 'জানা প্রশ্ন ঃ অজানা উত্তর'-এর উত্তর

১. লিথিয়াম
২. তিমিমাছ
৩. ব্যাঙ
৪. আফ্রিকার কৃষ্ণ হরিণ
৫. স্যার ওয়াটসন
৬. পিচ্‌ব্লেণ্ড (U_3O_8)
৭. তামা ও দস্তা
৮. শুক্রগ্রহের স্যাকারোল
১০. জৈব যৌগ টলুইন

কুপন

নাম ____________________ বয়স ________

অভিভাবকের নাম ____________________

ঠিকানা ____________________

____

গ্রাহক সংখ্যা / যে স্টল থেকে বই কিনেছ তার ঠিকানা ________

____________________ স্বাক্ষর/তারিখ

ফুটবলে দলবদল ঘিরে এমনটি কোথাও হয় না

হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

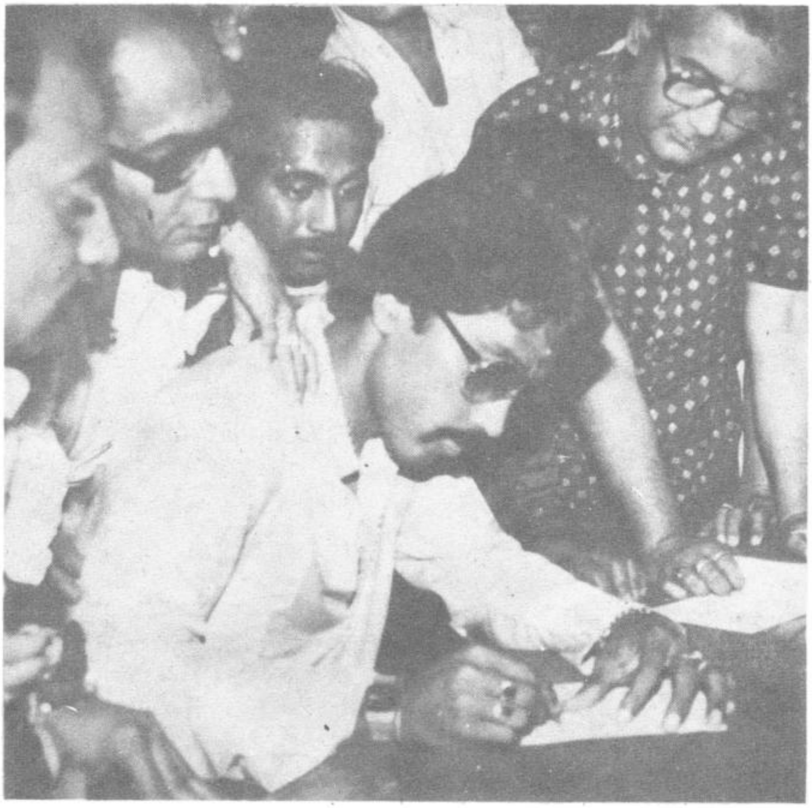

দলবদলে সবচেয়ে উত্তেজনা ছিল প্রশান্ত ব্যানার্জিকে ঘিরে। আলোকচিত্র : পাহাড়ী রায়চৌধুরী

কলকাতা ফুটবলে প্রতি বছর খেলোয়াড়দের দলবদল হয়। অর্থাৎ ফুটবলাররা এক দল থেকে অন্য দলে খেলার জন্য সই করেন। আবার অনেক খেলোয়াড় আছেন, যাঁরা একই ক্লাবে থেকে যাওয়ার জন্য নাম প্রত্যাহার করেন। খুবই অল্প সংখ্যক ফুটবলারেরও দেখা পাওয়া যায়, যাঁরা এক দলেই অনেক দিন ধরে খেলছেন। যেমন মোহনবাগানের সুব্রত ভট্টাচার্য এবার নিয়ে এগারো বছর রয়েছেন এই ক্লাবে, আর মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ইস্টবেঙ্গলে খেলছেন টানা আট বছর।

এই দলবদলকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই কলকাতা চনমনে হয়ে ওঠে। এবং এটা হয় তিন বড় দলকে কেন্দ্র করেই। সব নামীদামী ফুটবলারের ভিড় এই তিন ক্লাবেই। ভারতীয় ফুটবলেও কলকাতার এই তিন প্রধানই এখনো সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। ফুটবলারদের দলবদল পৃথিবীর সব দেশেই হয়। সেখানে টাকার অঙ্কটাও অনেক অনেক বেশি। তবে আমাদের এখানে বছরের পর বছর দলবদলকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা ও নাকটকীয়তা দেখা যায়, বিশ্বের আর কোথাও সেরকম হয় বলে জানা নেই।

কলকাতার দলবদলকে বলা যায় ১৫ দিনের এক জমজমাট নাটক। আগে দলবদল চলত এক মাস ধরে। এবং এটা হত আই এফ এ অফিসেই। পরে দলবদলের সময়সীমা ১৫ দিন কমিয়ে দেওয়া হয়। কয়েকবছর আগে বড় দলের সইয়ের জায়গাটা আই এফ এ অফিস থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রচণ্ড ভিড় এড়াবার জন্য। এখন দলবদল হয় নেতাজী ইণ্ডোর স্টেডিয়ামের অস্থায়ী কেন্দ্রে, প্রতিবছর মার্চ মাসে। এবার অবশ্য এপ্রিল পর্যন্ত গড়িয়েছে। প্রতিবছর সেখানে একটি অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করা হয়। স্টেডিয়ামের বাইরের গেটে অপেক্ষা করে থাকেন তিনবড় দলের উৎসাহী হাজার হাজার সদস্য সমর্থক। ও'দের কোন ক্লান্তি নেই। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন, কখন ও'দের কাঙ্ক্ষিত ফুটবলার প্রিয় দলে সই করতে আসবেন। সেই মুহূর্ত এলে ও'রা প্রবল উল্লাসে চিৎকার করে মনের মত খেলোয়াড়কে স্বাগত জানান। ইণ্ডোর স্টেডিয়ামের অস্থায়ী চত্বরটা তখন কেঁপে ওঠে। ফুটবলারদের পালাবদলকে কেন্দ্র করে এমন উন্মাদনা সত্যিই বিরল। সব কাজ দূরে সরিয়ে রেখে ও'রা জমায়েত হন এখানে। উত্তেজনাটা তুঙ্গে ওঠে দলবদলের প্রথম কয়েকদিন। তারপর কিছুটা ঝিমিয়ে পড়ে। আবার সরব হয় শেষ দিকে।

এরই মাঝে সাড়ম্বরে, হৈ হৈ করে বিরাট বাহিনী নিয়ে বড় দলের কর্মকর্তারা খেলোয়াড়দের নিয়ে আসেন সই বা উইথড্র করাতে। কখনো সারি সারি গাড়ি একসঙ্গে ঢোকে। সমর্থকরা উদ্বেলিত হন সেই গাড়ি ঘিরে। আবার কখনো কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারকে সই করাতে নিয়ে আসা হয় পুলিশ প্রহরায়। যেমন মোহনবাগান এবার নিয়ে এসেছে প্রশান্ত ব্যানার্জিকে। ইস্টবেঙ্গল থেকে প্রশান্ত সই করলেন মোহনবাগানে। প্রশান্তকে নিয়েই এবারের দলবদলের যাবতীয় নাটক ও বিতর্ক জমে উঠেছিল। ওকে নিয়ে তীব্র টানাপোড়েন চলেছিল দু প্রধানের মধ্যে। ইস্টবেঙ্গল চেয়েছিল ওকে ধরে রাখতে, আর মোহনবাগান চেষ্টা করেছিল দলে পেতে। বাজিমাৎ করল মোহনবাগানই। প্রশান্তকে নিয়ে এবারের দলবদলে যা ঘটেছে, কলকাতার ফুটবলের দলবদলে এমন জিনিস আগে কখনো ঘটেনি। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ভিক্টর অমলরাজকে নিয়েও এবার যথেষ্ট টানাটানি চলেছে তিন বড় দলের মধ্যে। এক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে মোহনবাগানেরই। প্রতিবছরই দেখা যায়, গুটি কয় খেলোয়াড়কে নিয়ে তিন প্রধানের মধ্যে তীব্র টানাপোড়েন চলে। এ'দের মধ্যেই প্রতি বছরই একজন করে খেলোয়াড় দলবদলের মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। তাঁকে ঘিরেই ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে শুরু হয় সবরকম জল্পনা কল্পনা। ৮১ সালে এমনই হয়েছিল ইরানী ফুটবলার মজিদ বাসকারকে

ঘিরে। মজিদ এবার আছেন মহমেডান স্পোর্টিংয়ে।

দলবদল শুরুর দু-তিন মাস আগে থেকেই আস্তে আস্তে আগ্রহ বাড়তে থাকে সমর্থকদের মনে। নানা গুঞ্জন ও গুজব ছড়াতে থাকে বাজারে। তিন বড় দলের কর্মকর্তাদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় নেপথ্য কর্মতৎপরতা। এই তৎপরতা খেলোয়াড়দের দলে টানার কিংবা পুরনো খেলোয়াড়দের দলে রেখে দেবার জন্য। এই কাজটা করতে তিন বড় দলেরই কিছু কর্মকর্তার আর সব কাজ মাথায় ওঠে, এমনকি নাওয়া-খাওয়া ভুলে গিয়েও ছুটোছুটি করতে হয় এদিক-সেদিক, নানা দিকে। এমনও দেখা যায়, কোন ক্লাবের একজন ফুটবলারই সেই ক্লাবের দলগঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। যেমন মহমেডানের মহিউল ইসলাম। শুধু এবার নয়, গত দু-তিন বছর ধরেই মহিউল ক্লাবের দল গড়ার ব্যাপারে দারুণ উদ্যোগ নিচ্ছেন।

দিনের পর দিন নানা আলাপ-আলোচনা এবং দর-কষাকষির পর মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল বা মহমেডান স্পোর্টিং হয়তো কোন প্লেয়ারের সঙ্গে চূড়ান্ত চুক্তি করল দলবদল শুরুর দশদিন আগে থেকে। সেদিন থেকে সই করাবার আগে পর্যন্ত সেই খেলোয়াড়টিকে ক্লাব একটি গোপন আস্তানায় রেখে দেয়, যাতে বিপক্ষ শিবির তাঁর কোন হদিশ না পায়। সইয়ের পরেও আরও তিনদিন একইভাবে কাটাতে হয়, কারণ ওই তিনদিনের মধ্যে সই করা যেকোন ফুটবলার নাম প্রত্যাহার করে নিতে পারেন।

আবার চূড়ান্ত কথাবার্তা হয়ে যাওয়ার পরও অনেক সময় কোন কোন খেলোয়াড় ক্লাবের হাতছাড়া হয়ে যান। এবারই মহমেডান স্পোর্টিংয়ের পেম দোরজি ও সুবীর সরকার ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ফাইনাল কথাবার্তা বলে এবং কিছু টাকা আগাম নিয়েও শেষ পর্যন্ত নাটকীয়ভাবে মহমেডানের অনুকূলেই নাম প্রত্যাহার করেন। এমন কি পেম দোরজি দিন সাতেক ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অতিথি হয়ে একজায়গায় থেকেছেন, খেয়েছেনও। তবে ঐ ব্যাপারে সবচেয়ে নাটকীয় ও চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছিল ১৭ বছর আগে, ৬৭ সালে। তখন সই হত আই এফ এ-র সুতারকিন স্ট্রিটের অফিসে। মহম্মদ হাবিবকে সই করাতে নিয়ে এসেছে মোহনবাগান। হাবিব তার আগের বছরই কলকাতায় এসেছেন এবং ইস্টবেঙ্গলে খেলেছেন। সেবার কিন্তু আই এফ এ অফিসে এসেও হাবিব মোহনবাগানে সই করতে পারেননি। তার আগেই এক নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে ইস্টবেঙ্গল সইয়ের পূর্বমুহূর্তে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়েছিল মোহনবাগান হেফাজত থেকে। দারুণ চাঞ্চল্যকর সেই ঘটনা।

কলকাতা ফুটবলের দলবদলে এই কথাটা জোর দিয়ে বলা খুব মুশকিল যে, অমুক খেলোয়াড় ওই দলে সই করছেনই। এখানে কিছুই বিশ্বাস নেই। আজ যেটা নিশ্চিত বলে জানি, কালই সেটা ওলটপালট হয়ে যেতে পারে। এর প্রধান কারণ, অবশ্যই টাকা। অধিকাংশ খেলোয়াড় যে দল বেশি টাকা দেয়, সে দলের জার্সিই পরেন। এখন কোন কোন ফুটবলার এক বছরের জন্য এক লাখ টাকারও বেশি পাচ্ছেন, যেটা ছ-সাত বছর আগেও অকল্পনীয় ছিল। তবে এবার সব নজীর ভেঙে দিয়েছেন প্রশান্ত ব্যানার্জি। কলকাতা ফুটবলে সবচেয়ে বেশি দর তিনিই পেয়েছেন এবার। এত অর্থ আর কোন খেলোয়াড় কখনো পাননি। ভারতীয় ফুটবলে কলকাতার মত এমন দলবদল আর কোথাও হয়নি। ভিন রাজ্যের অনেক ফুটবলারও ভারতীয় ফুটবলের মক্কা কলকাতায় আসার জন্য উদগ্রীব। এবং প্রতি বছরই কিছু ফুটবলার কলকাতায় আসেন যশ, সম্মান এবং অর্থের মোহে।

প্রতিবছর কলকাতায় অন্তত দু' হাজারেরও বেশি খেলোয়াড় দলবদল করেন। আবার অনেকে পুরনো দলে থেকে যাবার অঙ্গীকারও করেন। এই আসা-যাওয়া নিয়েই চলে প্রতিবারের দলবদলের খেলা।

কিশোর কিশোরীদের নিজস্ব পত্রিকা

কিশোর মন

তৃতীয় সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

লিও ওয়ালেসের বিখ্যাত উপন্যাসের নতুন রূপ

যুদ্ধের দেবতা

আজটেক সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণ করল স্পেনের দস্যুরা। আজটেকীরা মেতে উঠল স্বাধীনতা রক্ষার দুর্জয় সংকল্পে...... প্রতিহিংসা-ষড়যন্ত্র-আত্মত্যাগ ও আদর্শের উৎকণ্ঠিত উপন্যাস।

চারটি মনমাতান গল্প

আদর্শ ও বাস্তবের দ্বন্দ্বের গল্প

কুমার মিত্রর

পারিজাতপুরের মন্দির

চীন দেশের রূপকথা

মলয়শংকর দাশগুপ্তর

শংখমালা

লৌকিক-অলৌকিক যেখানে মিশে যায়

কার্তিক মজুমদারের

হাত

গ্রাম্যকিশোরের আশা বেদনার গল্প

নির্মলেন্দু গৌতমের

গগন

বিজ্ঞানের খাস মহলে

লোডশেডিং-এর কালে নতুন বিদ্যুৎ-শক্তির ভাবনা

শংকর চক্রবর্তীর

সাগর থেকে বিদ্যুৎ

একটি বহুবর্ণ সম্পূর্ণ চিত্র-উপন্যাস

সংগে

নারায়ণ দেবনাথের নতুন কমিকস

পেটুকমাণ্টার বটুকলাল

নিয়মিত বিভাগ।। কিশোর মনের প্রাংগণে, হাতে কলমে, সন্ধানী, মজার পাতা, তোমাদের বই, খেলাধুলো এবং একগুচ্ছ বিচিত্রস্বাদের ছড়া।

বড় মাপের ৬৪ পৃষ্ঠার এই রঙে ঝলমল, রসে ভরপুর পত্রিকাটির দাম – মাত্র তিন টাকা।

পোষা জীবের সংগে কিশোরীর নিবিড় ভালবাসার গল্প

অঞ্জনাদের কালোগাই

অশোককুমার কুণ্ডু

আকাশ জুড়ে মেঘ জমেছে। মেঘের রঙ ঘন কালো। যেন ফুলমামীদের ধান সেদ্দো করার বড় হাঁড়ির পেছন দিক। এখুনি নাগবে বৃষ্টি। বিকেলের সব আলো মুছে গেল। কালো আকাশ। অঞ্জনাদের ঘরের পাশে তালগাছটা এক পায়ে দাঁড়িয়ে। তার মাথায় দুটো বাবুই পাখি মুখ বের করল বাসা থেকে। আকাশটাকে দেখল। লাউ মাচায় বসা শালিক পাখিটা বসে বসে ভাবছে কি করবে এখন সে। পাল পুকুরের পাড়ে একটা গরু হাম্বা হাম্বা করে ডেকে উঠল। ঘুম ভেঙে গেল অঞ্জনার। তিন চারদিন ধরে ওর জ্বর। আজ একটু ভাল। বাবা গেছে বর্ষার লাঙল চষতে। মা গেছে কুয়োতলায় জল আনতে। ছোট ভাই বিলু এখন মোড়লদের জামতলায়। সে ছড়া কাটছে 'শিব ঠাকুরের ঝড়ে, একটি জাম পড়ে।' আর অঞ্জনা? ও ঘরে একা শুয়ে আছে।

ঝড় এল। অঞ্জনা জানলা বন্ধ করে দিল। খিড়কীর দরজায় মুখ গলিয়ে দেখল সে। মোড়ল জামগাছ, দূরে একটুখানি মাথা দেখা যায়। ওর মাথায় কালো আকাশ। ঝড়ে নুয়ে পড়ছে গাছের মাথা। মা তাড়াতাড়ি ছুটে এল জলভর্তি কলসি নিয়ে। অঞ্জনা মাকে জিজ্ঞেস করল, মা কালী কি বাঁধা আছে পুকুরপাড়ে?

মা কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলে, তুই যেন এই ঝড়ে বের হবিনে। মা অঞ্জনার কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখল।

অঞ্জনা আবার জিজ্ঞেস করল, কালীকে আনবে না?

হ্যাঁ হ্যাঁ আনা হয়ে গেছে। নে তুই এখন শুয়ে পড়ত। আমি সাবু করে দিচ্ছি।

অঞ্জনার সাবু খেতে একদম ইচ্ছে নেই। সাবুর কথা শুনলেই ওর এখন খারাপ লাগে। আহা! কতদিন দেখা হয়নি কালো গরুটার সঙ্গে! অঞ্জনা হাতের আঙুল গুনল। এক, দুই, তিন, চার। দেখবে নাকি গোয়ালে গিয়ে? গোয়ালে গিয়ে বলবে, কালী তোর রাগ হয়েছে? আমার ক'দিন জ্বর হয়েছিল তাই তোকে এতদিন জাবনা দিইনি, ঘাস দিইনি, বাঁশপাতা দিইনি। আমি ভাল হয়ে গেলেই তোকে আবার নদীর পাড়ে নিয়ে যাব। সেখানে অনেক কচি কচি ঘাস। তুই চরবি। আমি আর ভাই দুজনে মিলে নদীতে চেলা মাছ ধরব। তবে তুই একদম মিশবি না সন্তোষদের ঐ এঁড়ে গরুটার সঙ্গে। ওটা হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। সেদিন আমায় কিরকম তেড়ে এসেছিল। ভাগ্যিস আমি তখন শ্যাওড়া গাছে উঠে পড়েছিলুম।

বৃষ্টি এল তড়বড়িয়ে। এখন আর গোয়ালে যাওয়া যাবে না। বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ টিনের চালে—কে যেন খৈ ভাজছে। মা একটা গামছা মাথায় দিয়ে বের হল ভাইকে খুঁজতে। অঞ্জনার খুব ইচ্ছে হল গোয়ালে গিয়ে একটু কালীর সঙ্গে দেখা করে আসে। কিন্তু বৃষ্টিটা একদম দস্যি।

একটা ছেঁড়া চট মাথায় দিয়ে উঠোনে নামল অঞ্জনা। মাঠের রাস্তা থেকে শোনা যাচ্ছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বেরিয়েছে মাছ ধরতে। ওরা ছড়া কাটছে, 'ল্যালায় ল্যালায় জল যাচ্ছে, ট্যাঙরা মাছে কুকু দিচ্ছে, ওরে বেগুন ফোঁপরা, ইসকুলেতে বসে আছে, টেরিকাটা ছোকরা'। জ্বরের কোন মায়া দয়া নেই। না হলে এ সময় অঞ্জনাকে ধরে। ওকে এসময় ঘরে বসে থাকতে হবে। আর দেখ, রাজ্যের ছেলেমেয়েরা এই বর্ষায় মাছ ধরবে, জাম কুড়বে। কত মাছ উঠবে এই বর্ষার জলে! ডিমওয়ালা সরপুঁটি, গোঁফওয়ালা ট্যাঙরা আর কান খসখস করে হেঁটে যাওয়া কৈ মাছ। উঠোনে রাখা ছোট্ট জালটার দিকে তাকাল অঞ্জনা। গায়ে দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তেই মনে হল কে যেন চিমটি কাটছে। না, এই ফাঁকে গোয়ালে গিয়ে দেখে আসা দরকার। অনেকটা সময় কেটে গেল মা ফিরছে না, ভাইও। বাবা ফিরবে সেই বিকেলে। অঞ্জনা ছটফট করছে কালীকে দেখার জন্য। বৃষ্টিতে একটু ভিজলে আর কি হবে?

গোয়ালে যাবার আগে দুয়ারে দাঁড়িয়ে অঞ্জনা দুবার কালীর গলা নকল করে হাম্বা হাম্বা ডাকল। কালী শুনতে পেলেই হাম্বা করে সাড়া দেবে। না তো কই কালী সাড়া দিল না। অঞ্জনা আবার ডাকল, কালী, হাম্বা, হাম্বা।

এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে হয়ত শুনতে পাচ্ছে না কালী। নয় কালী খুব রাগ করে আছে অঞ্জনার ওপর। অঞ্জনা ভাবল কাল সকালে ওকে কচি কচি বাঁশ পাতা দিলেই আবার ভাব হয়ে যাবে। এই সব ভাবতে ভাবতে অঞ্জনা উঠোনে পা দিয়ে এক ছুটে গোয়ালে গেল।

ওমা, একি! গোয়াল একদম ফাঁকা। দেওয়ালের ফাটলে একটা সাপ চিক চিক করে উঠল। ওটা ওদের ভিটের বাস্তুসাপ। অঞ্জনা দুহাত তুলে নমস্কার করল। তারপর এক ছুটে পালাল পুকুরের পাড়ে। পুকুর পাড়ে সন্তোষদের এঁড়ে গরুটা ভিজছে। আর খোঁটা উপড়ে ফেলার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। অঞ্জনাকে দেখে কাজল পরা চোখে শিং বাঁকিয়ে হাম্বা হাম্বা করে। অঞ্জনা মনে মনে বলল কেমন জব্দ? সেদিন আমায় ঢুঁসিয়ে মারতে এসেছিলি তো। আমার বয়ে গেছে খোঁটা ওপড়াতে।

কিন্তু কালী কোথায় গেল? এদিক সেদিক তাকাল অঞ্জনা। পশ্চিমপাড়ের কুলবনের কাছে গেল। ডাকল দুবার; কালী কালী হাম্বা হাম্বা। কোন সাড়া নেই। শুধু সন্তোষদের এঁড়ে গরুটা সমানে ডেকে যাচ্ছে। বনের মধ্যে অঞ্জনার পায়ের শব্দ পেতেই একটা শেয়াল ছুটে পালাল। আর সেই শেয়াল দেখে পাল পুকুরের জলে ভাসা হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক করে উঠে চলল অঞ্জনাদের ঘরের দিকে।

না কোথাও নেই কালী। কোথায় গেল তবে? এই সব ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরল অঞ্জনা। শীত শীত করছে। জ্বর বাড়ছে। ও ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেল মা দাঁড়িয়ে আছে। ভাই বিলু জামের সঙ্গে নুন মেশাচ্ছে। বিলু বলল, মা ঐ তো দিদি।

মা অঞ্জনাকে দু এক ঘা কসাল। কাঁদতে কাঁদতে অঞ্জনা বলল, কালী গোয়ালে নেই তাই ওকে খুঁজতে গিয়েছিনু পাল পুকুরের পাড়ে। ওতো সেখানেও নেই।

মায়ের গলা এবার একটু নরম হল।

বলল, তুমি শুয়ে পড়ো, তোমায় আর খোঁজ করে কাজ নেই।

অভিমান নিয়ে জলভরা চোখে অঞ্জনা বলে, তবে যে তুমি তখন বললে গোয়ালে আছে?

মা বলল, তোর বাবা তাহলে ওকে মাঠে নিয়ে গেছে। তুই শুয়ে পড়্। তুই কেন জ্বর গায়ে বৃষ্টিতে ভিজে এলি? তোকে কত করে মানা করনু।

এরা কেউ বুঝবে না। কালীই শুধু বোঝে অঞ্জনা ওকে কতখানি ভালবাসে। জিভ দিয়ে কালী অঞ্জনার মাথা চেটে দেয়। অঞ্জনাকে দেখতে পেলেই গলা বাড়িয়ে দেয় চুলকে দেবার জন্যে। কাঁদতে কাঁদতে ঘরের মেঝেতে পাতা চ্যাটাইয়ের ওপর সে শুয়ে পড়ে। বিলু জামের বাটি নিয়ে ঘরে ঢোকে বলে, দিদি খাবি? খুব ভাল।

না মা বকবে জ্বর গায়ে জাম খেলে। —অঞ্জনা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

বিলু দিদিকে সান্ত্বনা দেয়। বলে, দিদি তুই ভাবছিস কেন। ও যেখানেই থাকুক ঠিক চলে আসবে।

অঞ্জনা রেগে গিয়ে বলে, থাক তোমায় আর আব্দার করে বলতে হবে না। তুমি কি খোঁজ রেখেছ এ কদিন কালী কোথায়?

বৃষ্টি থেমে গেছে। জানলা খুলে খিড়কীর বনের দিকে তাকাল অঞ্জনা। সমস্ত বনবাদাড় কে যেন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিয়েছে। কামিনী গাছে কত ফুল। ওর ডালে একটা দোয়েল শিস দিচ্ছে আর ল্যাজ দোলাচ্ছে। গোয়ালের দরজা খোলার শব্দ হল। বাবা মাঠ থেকে ফিরল। দুয়ারে পা দিয়ে বলল, অঞ্জু জ্বর কমেছে রে?

অঞ্জনা বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা কালীকে তুমি মাঠে নিয়ে গিয়েছিলে?

বাবা কিছু বলতে পারল না। বাবা মায়ের দিকে তাকাল। মা বলল, যা দস্যি গরু হয়ত পালেদের সজ্জী ক্ষেতে গিয়েছিল। খোঁয়াড়ে দিয়েছে।

বিলু বলল, মা খোঁয়াড়ে দিলে তো ছাড়িয়ে আনতে হবে।

খোঁয়াড় মানে তো সেই বিন্দীপুরের হাট। সে তো অনেক দূর। হাটের মাঝে চালা ঘর। দস্যি গরুরা কারুর ফসল নষ্ট করলে সেখানে দিয়ে আসে। আর যার গরু তাকে জরিমানা দিয়ে ছাড়িয়ে আনতে হয়। কিন্তু সেখানে তো কিছু খেতে দেয় না। আহ! বেচারী কালীর কি কষ্টটাই না হচ্ছে সেখানে। এতক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজছে। ঠিক হয়েছে। কালীটা একদম খারাপ হয়ে গেছে। কালীটা এত খারাপ ছিল না। সন্তোষদের ওই ষাঁড়টার সঙ্গে মিশেই ওটা খারাপ হয়ে গেছে। এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে তন্দ্রা এসেছিল অঞ্জনার।

সন্ধ্যেবেলায় ঝিঙে মাচায় হলুদ ফুল ফুটল। গোটা গ্রাম থেকে ঘরে ঘরে শাঁখ বাজছে। শাঁখে ফুঁ দিতেই অঞ্জনার ঘুম ভেঙে গেল। শুনতে পেল রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেজো পিসি মাকে বলছে, বড় বৌ কত টাকায় বেচলি তোরা কালো গাইটাকে? আগে জানলে আমরাই নিতুম।

মা বলল, চুপ চুপ দিদি, মেয়েটা শুনতে পাবে। এ সময় ঘরে বড় টানাটানি। তায় আবার মেয়ের অসুখ। আসলে আগাম টাকা নেওয়া ছিল কিনা ওই বন্দীচকের রসুল মিয়ার কাছে।

বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে অঞ্জনা। রাতে যখন সবাই খেতে বসল অঞ্জনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে সাবুর বাটি উল্টে দিয়ে বলল, তোমরা লুকিয়ে বেচে দিয়েছ কালীকে বন্দীচকের রসুল মিয়ার কাছে। আমি সবই জানি।

বাবা মাথা নিচু করে বসে রইল। মা লণ্ঠনের আলোটা একটু বাড়িয়ে দিল।

মাঝরাতে অঞ্জনার জ্বর বাড়ল। ভুল বকতে লাগল। কখনও ও কালীকে ডাকে হাম্বা হাম্বা করে। কখনও ডাকে রসুল মিয়াকে। বিলুর ঘুম ভেঙে গেল এইসব

চিৎকারে। সে দেখল কলাপাতায় দিদির মাথা ধরে আছে বাবা। মা জল ঢেলে যাচ্ছে। বিলু বেশ অবাক হল। পাশের বাড়ি থেকে সন্তোষ আর ওর বাবা এসেছে। অঞ্জনা বলছে, বিলু বাঁশপাতা দে কালী খাবে। রসুল মিয়া আমাদের কালীকে দিয়ে যাও। তোমার টাকা আমরা শোধ করে দেব।

এ কথা শুনে বিলু ফিক করে হেসে ওঠে। ভাবে দিদিটা কি বোকা।

অনেক রাত পর্যন্ত অঞ্জনা এরকম ভুল বকল। বাবা লণ্ঠন হাতে কবরেজ ডাকতে গেল শেষ রাতে। ভোর ভোর ঘুম ভেঙে গেল বিলুর। দেখল দিদি মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোচ্ছে। মাও ঘুমিয়ে আছে। বিছানা থেকে বিলু উঠে এসে খিড়কীর দরজা খুলল। ঝকঝকে আকাশ। সকাল হচ্ছে। ঝোপ-ঝাড় থেকে পাখিদের কিচির মিচির। ঝুড়ি চাপা দেওয়া হাঁস দুটো বাইরে যাবার জন্য প্যাঁক প্যাঁক করছে। বিলু ঝুড়ি তুলে দিতেই হাঁসদুটো ছুটে গিয়ে জলে নামল।

হাম্বা হাম্বা। ডাক শুনে বিলু গেল গোয়াল ঘরের দিকে। ওদের শ্যামলা বলদটা সাদা বলদটাকে অনেক সময় এমন ঢুঁসিয়ে দেয়। আর ও বেচারা তখন এমনি করে ডাকে। তখন বাবা গিয়ে শ্যামলাটাকে বেদম পেটায়। কিন্তু বিলু গোয়াল ঘরে গিয়ে দেখল বলদ দুটো চোখ বুজে জাবর কাটছে। আবার হাম্বা হাম্বা ডাক শোনা গেল। বিলু বুঝতে পারল ডাকটা আসছে খিড়কীর দিক থেকে। খিড়কীর দরজা খুলে ও অবাক হল। ডাক শুনে মায়েরও ঘুম ভেঙে গেছে। এই সাত সকালে কালী কোথা থেকে এল! মা দিদিকে কোলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। কালী খিড়কীর দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে শিং দোলায়। শিং থেকে রক্ত বের হচ্ছে। কালীর সারা গায়ে কাদা। কালী মাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে যায়। ঘুম ভেঙে বিস্ময় কাটতে অঞ্জনা বলল, আমায় ওর সামনে যেতে দাও মা, আমি ওর গলা চুলকে দিই।

কালীর কি খুশী! জিভ দিয়ে অঞ্জনার মাথা চাটে। মা চুন আর ন্যাকড়া আনতে গেল। কালীর শিংটা বাঁধা দরকার।

বিলু বাঁশগাছের মাথা থেকে চিৎকার করে বলে, দিদি খুব কাঁচ দেখে বাঁশপাতা পাড়ছি।

বাবা ফিরে আসে। ঘরে ঢুকে অবাক হয়। মা কালীর শিংয়ে ন্যাকড়া জড়াতে জড়াতে বলে, দরকার নাই আর। রসুল মিয়াকে বলে দিও টাকা ফেরত দেওয়া হবে।

বাবা চিন্তায় পড়ে। তবুও হাসিমুখে বলে, সেটাই ভাল।

রঙের ঘোড়া

রাখাল বিশ্বাস

কাঠের ঘোড়া ছোট্ট পায়ে
টগবগিয়ে চলতে পারে,
আঁধার রাতে মাতলা নদী
সাঁতরে গিয়ে বলতে পারে—
এই তো এলেম এই এখানে
সাঁঝ বেলাতে পাহাড় চুড়োয়
কেউ যদি গান গাইতে পারো,
চাঁদের হাসি মন সে জুড়োয়।
হালুম ডাকা বনের ধারে—
জটলা জড়ো করছে কারা?
তাও যে পারি সামাল দিতে
গোঁফ পাকিয়ে দিই পাহারা।
বারান্দার ওই অন্ধকারে
থাকতে আমি চাইছি না যে
কলকাতাটার জোয়ার-ভাটা
বুকের কাছে দেখছি বাজে।
বুক্‌নি যতো শুনছি মায়ের
কিচ্ছুটি নয়—চক্ষু জলে
ভাসছি দ্যাখো, রঙের ঘোড়া—
দিন কাটালো কৌতূহলে।

ছবি : সোমাকিন

গায়েত্রী··· বোন··· আমার বোন···
কে ! দাদার কণ্ঠ ! দাদা.... আমার দাদা ।
একি ! ভূমিকম্প !
দাদা ! কোথায় তুমি । আমি কি তোমাকে দেখতে পাব না !
গায়েত্রী নেই ! মন্দির নেই ! আমার রথ !
তবে কি আমি আজ থেকে তোমার আশীর্বাদ বঞ্চিত হলাম !
রাজধানীতে চলুন মহারাজ !
ক্লান্ত পায়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন শিলাদিত্য । সিংহাসনে মাথা রেখে ক্লান্ত শিলাদিত্য বসে আছেন ।
মহারাজকে এত ক্লান্ত দেখিনি জীবনে । এখন ওঁর পূর্ণ বিশ্রাম দরকার । অথচ···
এই অবকাশে যবন সেনারা দ্রুত এগিয়ে আসছে ।
তুমি রাজসভায় গিয়ে বল, হয় ধর্মান্তর গ্রহণ, নয় যুদ্ধ !
মহারাজ, আপনি ধর্মান্তর গ্রহণ করুন, না হলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত....
ধর্মান্তর গ্রহন ! এত স্পর্ধা দূতের ! আমরা যুদ্ধই করব ।

(গায়েব-গায়েবী পর্ব শেষ)

কে বেশি বোকা

একটি গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে চলেছে চারটি পথিক। অনেক ক্ষণ থেকে তারা একই পথে চলছে। ফলে আলাপ-পরিচয় হয়েছে নিজেদের মধ্যে। চারজনে যাবেও অনেকদূর—পথও একটাই। অতএব ওরা নিজেদের বন্ধু ভাবছে।

এমন সময় দেখা হল আর একটি লোকের সঙ্গে। তার মাথায় পাগড়ি, পায়ে নাগরা জুতো। হাতে মস্ত বড় লাঠি। তাকে দেখে এক পথিক বলল, লোকটা নিশ্চয় রাজা।

আর একজন বলল, ধুর! রাজার হাতে লাঠি থাকবে কেন? ও নিশ্চয় দারোয়ান।

তৃতীয়জন বলল, দারোয়ানের মাথায় অতবড় উষ্ণীষ থাকে না কি? ও নিশ্চয় কোতোয়াল।

চতুর্থ পথিক বলল, কোতোয়াল কখনও পায় হেঁটে যায়? একা একা চলে?

তৃতীয় পথিক বলল, তবে ও কে?

চতুর্থ পথিক বলল, কে তা বলতে পারি না, তবে ও যে গণ্যমান্য লোক সেটা বোঝা যাচ্ছে।

সকলে বলল, তা ঠিক। লোকটা গণ্যমান্য। দেখলেই সমীহ করতে ইচ্ছে করে। কি হাঁটার কায়দা! পাগড়িটা বাগিয়েছে কেমন! লাঠি ধরার ঢংটা দেখেছ!

এসব আলোচনা যতক্ষণ চলছে, ততক্ষণে লোকটা এসে গেছে একেবারে সামনে। সে ওদের দেখে হাসল। তারপর হাত জোড় করে নমস্কার করে চলে গেল।

লোকটা চলে যেতে ওদের খেয়াল হল, লোকটা প্রণাম করল কাকে! একটা নমস্কার তো চারজনকে করা যায় না। অতএব নিশ্চয় তিনজন বাদ। তাহলে কে সেই নমস্কারের যোগ্য আর অন্য তিন-জনই বা কারা!

সবাই বলতে থাকল, আমাকেই নমস্কার করেছে। বিবাদ বেড়ে উঠল। মীমাংসা আর হয় না। তখন চতুর্থ পথিক বলল, এক কাজ করা যাক। চল আমরা লোকটাকে খুঁজে বের করি। সেই বলে দেবে কাকে সে নমস্কার করেছে।

সকলে হৈ হৈ করে সমর্থন করল এ প্রস্তাব। তারপর উল্টো দিকে ঘুরে খুঁজতে চলল লোকটাকে।

ওদের ভাগ্য ভাল। লোকটা বেশিদূর যায়নি। একটু দূরেই এক পুকুরপাড়ে বাঁধান গাছতলায় বসে বিশ্রাম করছিল। ওরা ফিরে আসতে লোকটা আবার হাসল। বলল, নমস্কার!

ওরা বলল, আপনি কাকে নমস্কার করলেন?

লোকটা বলল, সবাইকে।

ওরা হেসে উঠল। বলল, আমাদের অত বোকা পাননি। একটা নমস্কার সবাইকে করা যায়! সত্যি করে বলুন তো কাকে নমস্কার করেছেন।

লোকটা আবার মৃদু হাসল। বলল, সত্যিই তো আপনারা ধরে ফেলেছেন আমার মিথ্যেটা। আসলে আপনাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বোকা, আমি তাকেই প্রণাম করেছি।

প্রথম পথিক বলল, তাহলে আপনি আমাকেই প্রণাম করেছেন।

সকলে বলল, কেন?

প্রথম পথিক বলল, শোন। একবার আমি যাচ্ছি মামা বাড়ি। সঙ্গে রয়েছে একটা ঘটি। জলটল খাবার জন্য আর কি! যেতে যেতে ক্ষিদে পেল। এক দোকান থেকে মুড়ি কিনে ঘটিতে পুরলাম। কিন্তু বিপদ্ বাধল মুড়ি বের করা নিয়ে।

সকলে বলল, কেন?

প্রথম পথিক বলল, ঘটিতে হাত ভরে মুড়ি নিয়ে মুঠো করলাম। হাত আর খোলে না। কত টানাটানি করলাম। শেষে কাঁদতে কাঁদতে মামা বাড়ি গেলাম। বড় মামা এক চড় মারতেই মুঠো খুলে গেল। হাত বেরিয়ে পড়ল। মুঠো খুললেই যে হাত বের হয়, আমার এ বুদ্ধি হয়নি। আমি এত বোকা।

দ্বিতীয় পথিক বলল, তার চাইতে বোকামি করেছি আমি।

সকলে বললে, বল।

সে বলল, একদিন আমার স্ত্রী বলল, ধোপাকে ডেকে কাপড় কাচতে দিতে। আমি কাপড়গুলো বোঁচকা বেঁধে নিয়ে চললাম ধোপা বাড়ি। তা দেখে ধোপার বৌ বললে, ওগো, যে ব্যাটা ধোপাকে না ডেকে নিজে মাথায় করে কাপড় বয়ে আনে তার মত বোকার কাপড় কেচো না। ধোপা কাপড় নিল না। ফলে আবার বাড়ি ফিরিয়ে আনলাম। শেষে অন্য লোক দিয়ে ধোপাকে ডেকে আমার স্ত্রী কাপড় কাচতে দিল।

তৃতীয় পথিক বলল, ভাই আমি এর থেকে বোকামি করেছি।

সকলে বলল, কি?

সে বলল, জান তো আমার দুই বৌ। একদিন দুই বৌ আমার দুই হাত ধরে বসে আছে। এমন সময় কপালে এক পিঁপড়ে কামড়াল। যে হাত তুলব, সে দিকের বৌ চটে যাবে এই ভেবে কোন হাতই তুলতে পারলাম না। আর সে ব্যাটা কামড়ে আমার চোখ মুখ ফুলিয়ে দিল।

চতুর্থ পথিক বলল, ভাই তাহলে আমিই সবচেয়ে বোকা।

সকলে বলল, কেন?

সে বলল, শোন তবে। একদিন আমি বৈঠকখানায় বসে বৌকে বললাম তামাক দিয়ে যা। বৌ তামাক ধরিয়ে বলল নিয়ে যাও। আমি ধমক দিয়ে বললাম, তুই দিয়ে যা। বৌ কেঁদে বলল, উঠোনে নামলে যে পায়ের আলতা ধুয়ে যাবে! কথাটা মিথ্যে নয়। উঠোনে জল আছে। আবার বৌ কথা শুনবে না, তাও সহ্য হল না। আমি ছুটে গিয়ে ওকে ঘাড়ে করে উঠোন পার করিয়ে দিলাম। তারপর বৈঠকখানায় বসে বললাম, এবার তামাক দে। বৌ দিল।

গল্প শুনিয়েও মীমাংসা হল না। ওরা সেই লোকটাকে বলল, গল্পগুলোতো শুনলেন, এবার বলুন কে সবচেয়ে বোকা।

লোকটা বলল, তোমরা এক কাজ কর। যাকেই দেখবে তাকেই এই গল্প-গুলো বলবে। যে স্থির করে দিতে পারবে তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে বোকা—প্রণামটা তাকেই দিও।

পথিক চারজন খুশি হয়ে লোক ধরতে চলল।

ধীরেন বিশ্বাস

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন : ২৪-০১৯৯), থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ২৭-২১৬৯, ২৭-৩৩১৬, ২৬-১৬৭৬, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১, Telex : 021-7896 IPL IN